সাহিত্য ও সমাজ

অথবা

বঙ্কিম বাবুর বিষ-বৃক্ষ।

"পারিজাত" হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এ,
প্রণীত।

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা
২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন, "কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৩।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

শুদ্ধি-পত্র।



		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫ পৃ,	১৮ পং,	টেঙ্গাইতে	ঠেঙ্গাইতে
ঐ	১৯ পং,	(২)	(৩)
৭ পৃ,	৭ পং,	পোলেম	পেলেম
৯ পৃ,	১৮ পং,	ভালবেসেই	ভালবেশেই
১০ পৃ,	৫ পং,	পইলাম	পাইলাম
ঐ	৮ পং,	ছন্দোবন্ধে	ছন্দোবন্ধ
ঐ	ঐ পং,	ছন্দহীন রচনা পদ্য	ছন্দহীন রচনা গদ্য
১২ পৃ,	১২ পং,	ব্যাকরেণের	ব্যাকরণের
১৩ পৃ,	১৩ পং,	যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
১৪ পৃ,	১৬ পং,	অদার্শ	আদর্শ
১৭ পৃ,	৩ পং,	সার্থপরতা	স্বার্থপরতা
২৫ পৃ,	৯ পং,	বিশষ	বিশেষ
২৭ পৃ,	২ পং,	শয়ক্ষক্ষে	শয়ন-কক্ষে
৪৩ পৃ,	৮ পং,	ইদানিক	ইদানীং
৪৫ পৃ,	১০ পং,	আভ্যান্তরীক	আভ্যন্তরিক

সাহিত্য ও সমাজ

অথবা

বঙ্কিম বাবুর "বিষ-বৃক্ষ"।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এত দিনের পর এই গ্রন্থের সমালোচনার প্রয়োজন কি? গুণ-বিচার যথেষ্ট হইয়াছে, তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। "বিষ-বৃক্ষ" বঙ্গদেশের স্ত্রী, পুরুষ, সর্ব্বজন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছে, ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বিলাতেও আদৃত হইতে চলিয়াছে। বঙ্কিমবাবু আর আমাদের জন্য লিখিতে আসিবেন না, তবে তাঁহার গ্রন্থের দোষ বিচারেরই বা প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর সহজ। গ্রন্থকার বঙ্কিমবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য ও সমাজে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আরও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, এবং উভয়েরই শুভাশুভ বিধান করিবেন। সাহিত্য ও সমাজের শুভাশুভ পর্য্যালোচনা করা যদি প্রয়োজন হয়; তবে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলীর দোষ গুণ-বিচার করাও প্রয়োজন। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সকলেই

এ কথা জানেন যে, জাতীয় উন্নতি অধিক পরিমাণে জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ ও সামাজিক রীতি-নীতির উন্নতি সাপেক্ষ, এবং ইহাও জানেন যে বঙ্কিমবাবুর ভাষা ও ভাবের তরঙ্গ এবং রচনা-প্রণালী বঙ্গীয় সাহিত্য ও সমাজে ওতপ্রোত ভাবে বিস্তৃত হইতেছে। ইহাতে কি পরিমাণ মঙ্গল ও কি পরিমাণ অমঙ্গল হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা চিন্তা ও আলোচনার বিষয় নয় কি? মঙ্গলের বিচার না করিলেও চলে, কিন্তু অমঙ্গলের বিচার অনিবার্য্য।

কেহ কেহ বলেন, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলীর মধ্যে "বিষ-বৃক্ষই" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু "বিষ-বৃক্ষ" যে তাঁহার একখানি প্রধান কাব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষার তারতম্য, বোধ হয় বিশেষ কিছু নাই, সকল গ্রন্থেরই ভাষা প্রায় একরূপ, কিঞ্চিৎ নূতন রকমের, এবং নাচনি ধরণের, যথা—

"নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়।"

জীবনের ও সমাজের এক এক বিভাগ আছে, যাহাতে এই ভাষায় লোকের মনকে মোহিত করে। চঞ্চল প্রণয়ের আখ্যায়িকার স্থলবিশেষে ভাষাতেও চপলতার প্রয়োজন আছে;

চরিত্র-চাঞ্চল্য জন্মাইতে ইহার বিশেষ শক্তি। কিন্তু অভ্যাস-ক্রমে শেষে বোধ হয় যেন সেই ভাষা সকল স্থলে সকল সময়ে এবং সকল লোকেরই তৃপ্তিকরী হইবে। অন্যের কথা দূরে, গ্রন্থকার নিজেই অনেক স্থলে ইহার মোহিনী শক্তিতে প্রতারিত হইয়াছেন। ভাষা এবং চরিত্রের চঞ্চলতা লোকের ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া যায়। পরে সেই চপলতা বুঝিতে পারিয়া, হঠাৎ গাম্ভীর্য্য এবং ধীরতা অবলম্বন করিলেও তাহা একরূপ অস্বাভাবিক ও অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। সকল দেশেই লিখিত এবং কথিত ভাষার প্রভেদ আছে। লিখিত ভাষা কতকগুলি বিশেষ নিয়মের অধীন। ইচ্ছা-পূর্ব্বক অথবা অনবধানতা প্রযুক্ত কেবল সেই নিয়মগুলির ব্যতিক্রম করিয়াই ভাষার আয়তন অথবা সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। সেই নূতনত্বে ভাষার বিশেষ কিছুই লাভ নাই। প্রত্যুত ভাষা ও চরিত্র গঠনের পক্ষে এইরূপ অনবধানতা অথবা স্বেচ্ছাচারিতা অহিতের কারণ হইয়া থাকে। নূতন প্রণালীতে লোকের মন মোহিত করা গ্রন্থকারের যেরূপ লক্ষ্য ছিল, লোক-শিক্ষা, ভাষার পরিশুদ্ধি ও উপযুক্ততা এবং ব্যাকরণের প্রতি গ্রন্থকারের সেইরূপ দৃষ্টি থাকিলে, সাহিত্য ও সমাজের সমধিক উপকার হইত। এ স্থলে কয়েকটী আদর্শ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেক কাল গাছ পালার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই রহমৎ মোল্লার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল, আর এক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃজন করিল।"

"আকাশে মেঘাড়ম্বর কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল। * * * কেবলমাত্র গর্জ্জনবিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিলেন—স্ত্রীলোকের ক্রোধ একবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নব বারি সমাগমে প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লিরব মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত রব করিতেছে"—ইত্যাদি।

(১) যে তুমুল ঝড়ে প্রাণের ভয়ে নগেন্দ্রকে বজরা হইতে নামিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় চপলতার একশেষ। আবার ঝড় থামিলে নগেন্দ্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। সেই সন্ধ্যা-সময়ের বর্ণনার শব্দোচ্চারণে মুখে বেদনা উপস্থিত হয়!

এই চাপল্য ও গাম্ভীর্য্যের হেতু বুঝিতে পারা যায় না। প্রথমোক্ত স্থলে যদি চাপল্যই উপযুক্ত অথবা আবশ্যক হয়, তাহা হইলেও রূপক বর্ণনায় "ভাই বৃষ্টি" না বলিয়া "ভগিনী বৃষ্টি" বলাই উচিত। প্রস্রবণের "সৃজন" না বলিয়া "সৃষ্টি" বলিলেই ঠিক হইত।

(২) ক্রোধে মানুষ "চমকিত" হয় না! অতএব স্ত্রীলোকের ক্রোধ একবারে হ্রাস প্রাপ্ত না হওয়াতে সৌদামিনী "চমকিতেছিলেন„ বলাও ঠিক হয় নাই।

রাবণের চিতার সহিত ঝিল্লিরবের উপমায় বিশেষ কিছু পারিপাট্য নাই, অথচ, ব্যাকরণ ধরিতে গেলে, "ঝিল্লিরব রব করিতেছে", হইয়া পড়ে!

"সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাহার চক্ষু সুন্দর বটে ** সুদীর্ঘ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম পল্লবরেখায় মধ্যস্থ, স্থূল কৃষ্ণ তারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতি বিশিষ্ট।"

"কেহ বা স্নানকালে বহুতৈলাক্ত অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন—যেন শ্রীকৃষ্ণ পাচনী হস্তে গরু টেঙ্গাইতেছেন।"

(২) পূর্ব্বরীত্যনুসারে পূর্ণচন্দ্রের সহিত মুখের তুলনা

করিতে গেলে, গ্রন্থকারের মতে "উদ্গীর্ণের উদ্গীরণ" করা হয়, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বলিলেও তাই। অতএব নূতনত্বের অনুরোধে "সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা" এস্থলে পূর্ণচন্দ্র ও তপ্ত-কাঞ্চন উভয়েই উপমান এবং বর্ণ উপমেয়, অথবা, তপ্তকাঞ্চনের সহিত পূর্ণচন্দ্রের উপমা এবং তাহার সহিত আবার বর্ণের উপমা।

ইহাতে অলঙ্কারের কারুকার্য্য কিছুই পরিলক্ষিত হয় না, অথবা, সূর্য্যমুখীর বিশেষণে "তুল্য" এবং "বর্ণা" বলাও ভাল হয় না। চক্ষুর সৌন্দর্য্য দেখাইতে অনেকগুলি কথা বলিতে হই-য়াছে, সেই বর্ণনার অধিকাংশ সকলের চক্ষুতেই খাটে। বিশেষ এই যে "ভ্রূযুগ অলকস্পর্শী ও তৎসমাশ্রিত চক্ষু মন্দগতিবিশিষ্ট। পূর্ব্বাপর রীত্যনুসারে চঞ্চলগতিবিশিষ্ট চক্ষুই সুন্দর এবং বোধ হয় সেই কথাই ঠিক। সেই জন্যই কবিগণ সুন্দরী স্ত্রীলোককে 'মৃগনয়না' বলিয়া থাকেন। মন্দগতিবিশিষ্ট চক্ষু সুন্দর কিনা অন্ততঃ সন্দেহের বিষয় বটে। আর অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ প্রতিমারই দেখি, মনুষ্যের হইলে তাহা সুন্দর কিনা, জানি না। বোধ হয়, এই সকল কারণেই গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুন্দর এবং অব্যবহিত পরেও বলিয়াছেন যে সূর্য্য-মুখীর চক্ষুর "অলৌকিক মনোহারিত্ব" ছিল।—"চক্ষু স্থূল কৃষ্ণ তারা সনাথ", এবং অন্যত্র (১০ম পৃঃ) "জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিসনাথ

চন্দ্র মণ্ডল" লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ভাষার বিড়ম্বনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'গরুঠেঙ্গানের' সহিত 'ডালে কাটি' দেওয়ার উপমা অতি কদর্য্য !

অন্যান্য বর্ণনাগুলি অধিকাংশই বীভৎস রসাত্মক এবং ঘৃণার বিষয়গুলিও লব্ধ প্রতিষ্ঠ বৈষ্ণব কবিগণ এবং দাশরথি, মধুকাণ, গোবিন্দ অধিকারী ও উমেশ মিত্র প্রভৃতির অনুরূপ, যথা :— "কথা কইতে যে পোলেম না, দাদা বলাই সঙ্গেছিল" ইত্যাদি। তবে এই গ্রন্থে বটতলার সরস্বতী-পূজার মন্ত্রাধিক্য নাই, উহা সংক্ষেপেই সমাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চ দেবতার পূজা একরূপে সারিয়া, গ্রন্থকার শীঘ্রই মূলদেবতার পূজায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার স্থানে স্থানে অযৌক্তিক কিন্তু আপাতশ্রুতিমধুর দার্শনিকত্বেরও অভাব নাই। এই ভাষায় যে সাহিত্যের উপকার হয় নাই তাহা নহে, প্রত্যুত প্রভূত উপকার হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা যে কেবল বাঙ্গালা অক্ষরে বিশুদ্ধ সংস্কৃত কিম্বা প্রাকৃত সস্কৃত নহে, তাহা বোধ হয় বঙ্কিমবাবুর ন্যায় তাহার পূর্ব্বে আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। সেইজন্যই বলিয়াছি, বঙ্কিমবাবু আরও অনেক দিন বাঁচিবেন এবং আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা ও তাঁহার উদ্ভাবনা শক্তির গুণে তাঁহার ভাষার দোষগুলিও গুণ বলিয়া বোধ হইয়াছে।

অনুকরণের নানা দোষ। প্রতিভার অনুকরণ নাই। আর সকলেরই অনুকরণ আছে। অনুকরণ-রোগটা সাহিত্য-জগতে একরূপ সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রোগের যেরূপ বিস্তৃতি, উহা হইতে কেহই, বোধ হয়, রক্ষা পাইবেন না। বঙ্গীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বোধ হয় এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। লোকে কথায় বলে—"শঙ্করাচার্য্যকে যদি খায় বাঘে, তবে আর অন্য কেবা কিসে লাগে"! ইহাঁরা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের নেতা। ইহাঁদের দোষের তীব্র আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন, এবং ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে। অতএব, পাঠকমহাশয়দিগকে অনুরোধ করি, "মেঘনাদ বধ" কাব্যের হেমবাবুর লিখিত সমালোচনা বা ভূমিকার দুই চারি পৃষ্ঠা পাঠ করুন, তাহা হইলেই রোগের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। লক্ষণটা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি—সমালোচনার তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে পড়িবেন "অমিত্র ছন্দ" এবং ভাবিয়া দেখিবেন ছন্দই অমিত্র কিম্বা অক্ষরই অমিত্র! যাহা হউক, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিলে "উদ্গীর্ণের উদ্গারণ" হইয়া পড়ে! চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে "এই পয়ারপ্লাবিত দেশে" ইত্যাদি পড়িয়া বুঝিবেন যে, রোগের নিতান্ত প্রাথমিক অবস্থাও নয়। দ্বিতীয়পৃষ্ঠার দ্বাদশ পঙ্‌ক্তিতে আসুন;

দেখিবেন যে প্রলাপ আরম্ভ হইয়াছে!—"নির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজন বিশিষ্ট শব্দবিন্যাসের নাম পদ্য"। শব্দের ওজন কি?—অর্থ? তাহার সহিত গদ্যপদ্যের সংস্রব নাই! তবে কি হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরবর্ণ? বাঙ্গালাতে তাহারও ব্যবস্থা নাই! যদি সৃষ্টি করিয়াই লওয়া যায়, তাহা হইলেও হ্রস্ব দীর্ঘকে 'ওজন' কিরূপে বলি? আবার ১৫ শ পঙ্ক্তিতে লিখিত আছে "মিলিত এবং অমিলিত পদ"—কিরূপে? সন্ধি না সমাস দ্বারা মিলিত? আবার ২০ তি পঙ্ক্তিতে—"ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার স্বরূপ; কারণ গদ্য রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতালক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতা-রসাস্বাদনের সম্যক্ সুখ অনুভূত হয়; ইহার দৃষ্টান্তস্থলে কাদম্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে।" ইহার পূর্ব্ব তিন পঙ্ক্তির ভাবার্থ কবিতার লক্ষণাক্রান্ত, অর্থাৎ, কবিতা হইলেই কাব্য হয়। লক্ষণ বিচার করিয়া বুঝি সমালোচকও কবিতা লিখিতেছেন! "ছন্দ কবিতার পরিচ্ছদ এবং পদ কবিতার অলঙ্কার"। সমালোচক গদ্য লিখিতেছেন সুতরাং তাহাতে উহার কিছুই নাই। ভালবেসেই সমালোচক বিলাত প্রত্যাগত কবির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে যাহা হুউক, এস্থলে যেরূপ যুক্তিক্রমে "সুতরাং"

বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইল পাঠক তাহাও একটু চিন্তা করিয়া দেখুন্। সমালোচকের ন্যায়শাস্ত্রে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সমধিক বিদ্যা থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষার দোষেই হউক, কিম্বা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক, তাহার পরিচয় বিশেষ কিছুই পইলাম না। সমালোচক বুদ্ধির পরিচয় দিতে যাইয়া, বোধ হয়, বিদ্যাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যার কথাটা সহজ ও সংক্ষিপ্ত—"কাব্য গদ্যে পদ্যে কিম্বা উভয়েই রচিত হইয়া থাকে। ছন্দোবন্ধে রচনা পদ্য এবং ছন্দহীন রচনা পদ্য। ছন্দ পদ্য কাব্যের অঙ্গস্বরূপ। তাহার এক এক অংশের নাম পদ অথবা চরণ। প্রতি চরণে অক্ষর অর্থাৎ বর্ণের সংখ্যা এবং কদাচিৎ হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা এবং পদের অন্তে যতি অথবা শ্বাসপতনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। পদের শেষাক্ষরের সমতা থাকিলে সম, মিল বা মিত্রাক্ষর ছন্দ হয়, না থাকিলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ হয়। গদ্য কাব্যেরও অঙ্গাংশের নাম পদ বা সার্থক শব্দ।" বুদ্ধির কথা কিন্তু অন্যরূপ। নূতনত্ব না থাকিলে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব উহার কথা বড় সহজ নহে। বঙ্গভাষায় ত্রিবিধ রচনা প্রচলিত আছেঃ—১ম, সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ প্রণালীর সাধুভাষা। ২য়, প্রাকৃত বা সাধারণ প্রণালীর প্রাকৃত ভাষা। ৩য়, উভয়ের মিশ্রণে মিশ্রিত বা চলিত ভাষা।

নাটকাখ্যিকা আখ্যায়িকার সংখ্যা পূর্ব্বে বড় অধিক ছিল না। বঙ্কিমবাবু তাহার সংখ্যা ও গুণের বৃদ্ধি করিয়া, এবং তদুপযোগী রচণা-প্রণালীর বিস্তার করিয়া, বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও গুণের কথা। দোষের কথাও আছে।—বিলম্বে কার্য্য হইবে না, সহসা বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া অতীব আবশ্যক, তাহা হইলেই নূতনত্বের প্রয়োজন। যদি নূতন পথ না পাও, তবে পুরাতন পথের নিন্দা কর, তাহার পর ভালই হউক, আর মন্দই হউক, পুরাতন রীতির বিকৃতি করিয়া নূতন আকার দেখাও—সংক্ষেপতঃ, যে রূপেই হউক নূতনত্ব দেখাও। ইহাতেই বটতলার সরস্বতীর নিন্দায় "পয়ার-প্লাবিত দেশ", "পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা" ইত্যাদির ন্যায় "অমিত্র ছন্দ", "মিলিত পদ", "অমিলিত পদ", "ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারস্বরূপ", ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বের লক্ষণ করিতে যাইয়া বর্ণনায় প্রগল্‌ভতা, "ভাই বৃষ্টি", ও "প্রস্রবনের স্বজন" ইত্যাদির ন্যায় "যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে" ইত্যাদি অনবধানতা, ভাষায় স্বেচ্ছাচারিতা ও বিশুদ্ধ রীতির প্রতি অবহেলা বঙ্কিমবাবুর ন্যায় হেম বাবুর আড়াই ছত্র ভূমিকাতেও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

ইতঃপূর্ব্বে হেমবাবুর লিখিত ভূমিকার যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার আরও ছয় পঙ্‌ক্তি ছাড়িয়া আসুন, বিকারের অবস্থা দেখিতে পাইবেন! "কবিতারূপ পীযুষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়,"—হয় হউক, কবিতারূপ পানীয় চিত্তের পক্ষে নারিকেলের ছোলের দড়ি, এবং মনের পক্ষে রং, অথবা আর যাহা হয়, হউক। কিন্তু চিত্তকে আকর্ষণ করা ও মনকে রঞ্জিত করার কিছু বিভিন্নতা আছে কি? আমরা বুঝি, চিত্তাকর্ষণ, চিত্তরঞ্জন এবং মনোরঞ্জনের একইরূপ তাৎপর্য্য। বঙ্কিমবাবুর ভাষাটাও এইরূপ একটা দৃষ্টান্ত, যথা,—নদীর জল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে"—ইত্যাদি। এ স্থলে "চল্ চল্ চলিতেছে ও ছুটিতেছে" জল অশ্রান্ত ইত্যাদি কি একই অর্থবোধক নহে? তার পর ব্যাকারণের কথা। যাক্ রসাতলে যাক্—বাঙ্গালার আবার ব্যাকরণ! ইঁহারা কুলীন লেখক ভাষা জন্মাইতেছেন, ভাষা যেদিন যেরূপে পারে ব্যাকরণ জন্মাইবে। সেক্ষপিয়রের জন্য যদি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইল, তবে ইঁহাদের জন্য না হইবে কেন? ইংরেজী চইল কিনা পাঠকমহাশয়গণ তাহাই দেখিবেন! আবার আর একটা নমুনা দেখুন—"ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদায়ই করুণ কিম্বা আদি রসে পরিপূর্ণ"। ভ্রূকুটি করা মিছা!—"কিছু"

"টুকু" ইত্যাদি না হইলে, ভাল গদ্য হয় না! "দুধটুকু মধ্যে ক্ষীরটুকু" হয়। এই "টুকু টুকু" ছাড়িয়া দিয়া প্রৌঢ়া বিমলার রূপের গাঢ়ত্ব অথবা বহুদর্শী প্রেমিকের ভালবাসার গাম্ভীর্য্য বুঝান্ দেখি, পারেন কি না? "কিছু পুস্তক" হয় কি? পুস্তক প্রচার হইয়াছে" হয় না? সমাসেও তো 'পুস্তক-প্রচার' পদ রাখা যাইতে পারে। তাহা হইলে "কিছু প্রচার" বলা যায়— তৎসমুদায়ই অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রচারই না হয় "করুণ কিম্বা আদি-রসে পরিপূর্ণ" হইল। করুন দেখি "পাব্লিকেশন" পদের অনু-বাদ, এই সমুদায়ই খাটে কিনা? বিষ-বৃক্ষের আড়াই পৃষ্ঠার সহিত হেমবাবুর লিখিত ভূমিকার আড়াই পৃষ্ঠার তুলনাতে বিষয়-ভেদ থাকা সত্ত্বেও এতগুলি দোষের সাদৃশ্যস্থলে, অনুকর-ণের অনুমান হইতে পারে। কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলে পাঠক মহাশয় বর্ত্তমান সাহিত্যে এইরূপ দোষানুকরণের যথেষ্ঠ প্রমাণ পাইবেন। ফলতঃ ভাষা-প্রয়োগে স্বেচ্ছাচারিতা ও অনবধানতা বর্ত্তমান্ সাহিত্যের এক দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার নিদান বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। এই রোগ, বিশেষ মারাত্মক না হইলেও, অত্যন্ত সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। আপাততঃ গ্রন্থরচনা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকারের অভাব নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

প্রতিভার অনুকরণ নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা ছিল সত্য, কিন্তু নভেলে সে প্রতিভার অনেক স্থলে অপব্যবহার ঘটিয়াছে, এবং অনুকরণ আপাততঃ তাহারও বিশেষ অপব্যবহার ঘটাইতেছে! তাঁহার নিষ্প্রতিভ অনুকারিগণ একটা প্রণয়ের গল্প লিখুন, অথবা যিনি যাহাই লিখুন, তাহাই মুদ্রিত করা হইতেছে! নিষ্কর্ম্মা লোকের অভাব নাই, মুদ্রাযন্ত্রেরও অভাব নাই, বাঙ্গালা ভাষা লেখারও বিশেষ কিছু নিয়ম নাই, লিখিতে বসিলেই লেখা যায়, এবং যাহা লেখা যায়, তাহাই উত্তম বাঙ্গালা হয়! বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সতেজ সাধুভাষা উড়াইয়া দিয়া এক অযোনিসম্ভবা বাঙ্গালা ভাষার আবির্ভাব হইয়াছে! ইনি কি দেবতা না অপদেবতা, সুস্থা কিম্বা উচ্ছৃঙ্খলা উম্মাদিনী? ফলতঃ বঙ্কিমবাবুর অনুকরণ বঙ্গভাষার গৌরব, ওজস্বিতা ও ভাষা-বৈভব সম্বর্দ্ধনের পথে দিন দিন কণ্টক রোপণ করিতেছে।

এখন! বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক তাঁহার আদর্শ চরিত্রগুলি সুশিক্ষা ও সুনীতির বিরোধী কি না?—তাঁহার "বিষ বৃক্ষ" সমাজ-ক্ষেত্রে অমৃতময় কি বিষময় ফল প্রসব করিতেছে।

গ্রন্থকার না বলিয়া দিলে, পাঠক কুন্দনন্দিনীকে এই গ্রন্থের

নায়িকা বলিয়া চিনিতেন কিনা, জানি না। বলি, সূর্য্যমুখী নায়িকা নয় কেন? নায়িকার লক্ষণ ও অধিক পরিমাণে তাহাতেই আছে। বিশেষতঃ, গ্রন্থকারের মতে, হিন্দুনায়িকার যে গুণ না হইলে না হয়, তাহাও তাহাতে প্রচুর পরিমাণে আছে—অর্থাৎ, রূপ-যৌবন সম্পন্না হিন্দু ভদ্রকুলবধুর একবার ঘরের বাহির হইয়া যাওয়া চাই! তাহাতে ভয়ও নাই, লজ্জাও নাই,—কেন না ইহাই হিন্দুসমাজের পূর্ব্বাপর ও বর্ত্তমান আচার!—বিশেষতঃ, খিড়্কির বাগানে ভিন্ন, মাঠে, ঘাটে, হাটে, জঙ্গলে, বিষ বৃক্ষ জন্মে না! আর বিশেষ উর্ব্বরা ভূমিতে পূর্ব্বে তাহার চারা করিয়া নিতে হয়! আদর্শ-চরিত্র নগেন্দ্রের ন্যায় উর্ব্বরা ভূমিতে ভিন্ন সেই চারা জন্মে না। তবে আর যুবতীর দেশ-ভ্রমণে ভয় কি? সূর্য্যমুখী টাকাকড়ি সকলই ফেলিয়া গেল, তবে হিন্দু মহিলার আর কি ধন আছে যে দস্যুতে অপহরণ করিবে? অতএব হিন্দুকুলযুবতী নিঃশঙ্কচিত্তে সচরাচরই এইরূপ একাকিনী বাহির হইয়া থাকে ও বাহির হইবে, অথবা তাহার বাহির হওয়া উচিত! কেন না স্বামীর পদে হিন্দুরমণীর আত্মোৎসর্গ, আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জনের ইহা অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, এবং মনুষ্য-সমাজের বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের, স্বাভাবিক! তবে গ্রন্থকার সূর্য্যমুখীকে নায়িকা না

বলিয়া কুন্দনন্দিনীকে নায়িকা বলিলেন কেন ?—ইহার বিশেষ কারণ আছে। নাটকাখ্যিকা আখ্যায়িকা সমাজের দর্পণ। স্মুতরাং, সূর্য্যমুখীর চরিত্র স্বাভাবিক হইলেও কুন্দনন্দিনীর চরিত্র তাহা অপেক্ষা হিন্দুসমাজের অধিকতর স্বাভাবিক ও উপযুক্ত। সূর্য্যমুখী সামান্যা সতিনী, কুন্দনন্দিনী বিধবা-সতিনী। সতিনী ঘরে আসাতে, সূর্য্যমুখী বাহির হইয়া যায়! নগেন্দ্র বাড়ী আসিয়াই, কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ না করাতে, সে বিষ খাইয়া মরে! স্মুতরাং, পতির প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি কাহার অধিক ? ইহার কোন্ অনুষ্ঠান হিন্দু সমাজে অধিকতর প্রচলিত আছে বা হওয়া উচিত ? গ্রন্থকার আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, সূর্য্যমুখীর অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল এবং কার্য্যে দেখাইয়াছেন যে, প্রণয়ে তাহার অস্বাভাবিক ও অলৌকিক আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন ছিল। তাহার চরিত্রে তাহাই দেখান তাঁহার অভিপ্রায়, অতএব তাহাকে প্রণয়ের সেই উচ্চ সোপানে আনিয়া, তাহাই প্রথমে দেখাইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তাহার রূপজ মোহ কি গুণজ প্রণয় হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে এই কথা বলা যায় যে, তাহার আত্মোৎসর্গ অথবা আত্মবিস্মৃতি বিশেষ কিছুই নাই। স্বামী ভগবান্, এই জ্ঞান হেতু ভক্তিজন্যা প্রীতি না হইলে, তাহা হইতে পারে

না। স্ত্রী ও পুরুষ কেবল পরস্পরের ভোগ্য বস্তু বলিয়া, কিছু-মাত্র জ্ঞান থাকিলেও, সেই আত্মবিস্মৃতি হইতে পারে না। পরস্পরের ভোগলালসার নিবৃত্তি না হইলে স্বার্থপরতা শেষ হয় না। দর্শন, শ্রবণ, মননেও যখন আনন্দ হয়, তখনই পরস্পরের তন্ময়তা জন্মে। তখন আর অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই। তখন প্রকৃতির কথা—

"আমার অঙ্গের ভূষণ নয়ন অঞ্জন
তুমি হে কালিয়া চাঁদা,
জ্ঞানদাস কহে, তোমার পীরিতি
অন্তরে অন্তরে বাঁধা।"

এবং পুরুষের কথা—

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

এই অবস্থাতেই স্ত্রীর পূজ্য স্বামী এবং স্বামীর পূজ্যা স্ত্রী। সূর্য্যমুখীর বিলাতী প্রণয়ে এ অবস্থার কিছুই দেখিতে পাই না, অতএব তাহার আত্মবিস্মৃতি কি? বিলাতী হিসাবেও সূর্য্যমুখীর প্রণয় অলৌকিক! 'বিলাতী' বলি এইজন্য যে, সূর্য্যমুখী স্বামীর বংশরক্ষার্থে সতিনী-সঙ্গ সহ্য করিতে পারিল না। সেই প্রণয়—"My lord! kingdoms may be divided but not

Love"! সূর্য্যমুখী আপনিই সেই সতিনীকে আনিয়া দিল, এই জন্য তাহার প্রণয় বিলাতি হিসাবেও অলৌকিক! গ্রন্থকার কথায় কথায় যে প্রণয়-বর্ণনার নিন্দা করিয়াছেন—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি না,
আমার স্বভাব এই, না বাসিলে বাঁচিনা।"

তাহাও সূর্য্যমুখীর নাই!—ভালবাসার কেনা-বেচায় কিঞ্চিৎ কম মূল্য পাওয়াতেই, সে ঘরের বাহির হইয়া গেল! ইহার নাম আত্মবিস্মৃতি ও তজ্জনিত আত্মবিসর্জ্জন নহে—অহঙ্কার! তাহা হইতে, ইচ্ছা করিয়া, একরূপ আত্মবিসর্জ্জন হইতে পারে, সূর্য্য-মুখী ও কুন্দনন্দিনী উভয়েরই তাই—হীরারও তাই। এই আত্ম-বিসর্জ্জনের অর্থ প্রণয়ীজনের কথঞ্চিৎ নির্যাতন। কুন্দনন্দিনীর তাহা বড়ই খরতর। সে বলিল—"আমাকে ত্যাগ করিলে কেন"? পরে বিষ খাইয়া মরিয়াই গেল! সূর্য্যমুখীও তাহার বাহির হইয়া যাওয়ার কারণ কমলমণিকে বলিয়াছিলেন, যথা—"আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায় ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!"—অতএব পাঠক ভাবিয়া দেখুন, ইহার মূলে আত্মবিস্মৃতি, না তীব্র স্মৃতি, না অহঙ্কার রহিয়াছে? সূর্য্যমুখী যখন দেখিলেন যে, নগেন্দ্রের সঙ্গে আর পারিয়া উঠিলেন না, তখন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক

াহা করিলেন, সেই জ্ঞানকৃত ক্রিয়ার নাম আত্মবিসর্জ্জন
না হইয়া হিংসা হওয়া উচিত! আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর আত্ম-
বিসর্জ্জনের সহিত ইহার কোনও তুলনাই হইতে পারে না।
আমাদের, বিলাতি প্রেমের শিক্ষা দীক্ষা লইয়া, সে প্রেমের
প্রাঙ্গনেও যাইবার অধিকার নাই! সূর্য্যমুখী বলেন—"পৃথি-
বীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী"
এই সম্পত্তি শব্দের অর্থ কি, তাহাও তিনি বলিয়াছেন, যথা—
কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া, আপনি গৃহত্যাগ করিয়া
যাইব, কেননা আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে
দেখিতে পারি না"—বিলাতী হিসাবে এ কথা ঠিক। প্রণয়ের
এক অবস্থা আছে, যাহাতে এই কথা সকলেরই স্বাভাবিক।
কিন্তু তাহা হইলেও এই অবস্থা আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জনের
বিপরীত। আরও অনেক সিঁড়ি উঠিলে, তবে হিন্দুরমণীর প্রেমের
সেই স্বাভাবিক ও উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অবস্থার
কথা এই :—

"তোমার আছয়ে অনেক জনা,
আমার কেবল তুমি"! ইত্যাদি।

সে যে অব্যয় সম্পত্তি, তাহা আদান প্রদানের অতীত!—
দিলে নিলেও তাহার হ্রাস হয় না। গ্রন্থকার যাত্রার দলের

অধিকারীর ন্তায় আমাদিগকে সেই উচ্চ ভাবের কথা বলিয়া দিতে পারেন—(অথবা নায়িকাই সূত্রধর হইয়া সেই কথা বলিয়া দিতে পারেন)—কিন্তু গ্রন্থকার নিজেই যদি সে উচ্চ ভাবের ধারণা করিতে না পারেন তবে তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রে আর তাহা কোথা হইতে চিত্রিত হইবে? সূর্য্যমুখী মুখে বলিলেন—"পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী"—কিন্তু সে চিন্তায় নিজের চিন্তা মিলাইয়া গেল না। যখন এই নিজের চিন্তা স্বামি-চিন্তায় ক্রমশঃ মিলিয়া, তাহাতে লীন হইতে থাকে, যখন প্রেমিকার নিজের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে, তখন অনেক দিন দেখা না পাওয়াতে, স্বাভাবিক নিয়মে, সে নিজেকে একরূপ ভুলিয়াই যায়—তখনই আত্মবিস্মৃতি! ইচ্ছা করিয়া কেহ তাহা করিতে পারে না। সূর্য্যমুখীও ইচ্ছা করিয়া তাহা পারিল না। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে আত্ম সমর্পণ করে নাই। তাহা তাহার আপনারই ছিল, কাজেই তাহা যথাতথা পাঠাইতে পারিল, নগেন্দ্রের গৃহ ছাড়িয়া যাইতে তাহার মনে কোনও বাধা হইল না। কিন্তু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে আত্মদান না করিলেও সে নিজে নগেন্দ্রকে চাহিত, সেইজন্ত তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। সে জানিত, নগেন্দ্র তাহার অভাবে

কাতর হইবেন—তাহাকে চাহিবেন। নিজেও শিখিল, নগেন্দ্রের পূর্ণ ভালবাসা পাওয়ার যখন আর সম্ভাবনা নাই, নগেন্দ্রকে না দেখিয়াও যখন সে আর থাকিতে পারে না, তখন সে আপনিই ফিরিয়া আসিতে লাগিল। নগেন্দ্রেরও শিক্ষা হইল—তিনিও তাহাকে আনিতে গেলেন। এই ক্রিয়াতে পরস্পরের আদান ভিন্ন প্রদান নাই। আত্মসমর্পণ ভিন্ন আত্মবিস্মৃতি হওয়া অসম্ভব। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে—"কোদালকে কোদালিই বল" ("Call a spade a spade"!) গ্রন্থকারও যদি তাহাই করিতেন, তাহা হইলে সমাজের তত অনিষ্ট হইত না। অধিকারীর প্রস্তাবনায় এই স্বার্থপরতা অথবা কামুকতাকে, হিন্দুস্ত্রীর আদর্শ আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন বলাতে সমাজে যে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, তাহার কতকটা বোধ হয়, গ্রন্থকার নিজেই বুঝিতে পারিয়া, তজ্জন্য কথঞ্চিৎ পরিতাপও করিয়া থাকিবেন। ভাবগতি দেখিয়া বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের চিন্তাশীল অনেকেই ইহাতে সন্তপ্ত হইতেছেন। গ্রন্থকারের মতে, আদর্শ চরিত্র নগেন্দ্র চিত্তসংযমনের চেষ্টা করিয়া যখন দেখিলেন, যে নিজের সঙ্গে আর পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন তিনি পঞ্চ মহাপাপের এক পাপ করিলেন! কুন্দনন্দিনী ও মহা পাপকার্য্য করিল! সূর্য্যমুখীও বড়

কম করিল না! এই সকল কার্য্য মনের একরূপ বিকৃত অবস্থা হইতে উৎপন্ন, এবং গ্রন্থকারের মতে তাহাই আদর্শ আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন! কেহ কেহ বলিবেন, এতাধিক আত্মসমর্পণ ও আত্মবিস্মৃতি কবির কল্পনামাত্র, মনুষ্যের স্বাভাবিক নহে। কিন্তু, অভ্যাসও দ্বিতীয় স্বভাব! বাল্মীকির কৌশল্যা এবং ব্যাসের সুনীতি প্রভৃতি কাল্পনিক অথবা অস্বাভাবিক হয় হউক, কিন্তু তাঁহাদের প্রশস্ত আদর্শ হইতে সহস্র সহস্র বৎসর হিন্দু সমাজের যাহা অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহা এখন হিন্দুসমাজের স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে পাঠক-মহাশয়ের অনুমতি লইয়া, সংক্ষেপতঃ একটী গল্প বলিতে চাই! একজন বাজীকর শূকর-শিশুর শব্দ অনুকরণ করিয়া, সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল, সকলেই বলিতে লাগিল—"ঠিক স্বাভাবিক শব্দ, বাজীকরের অদ্ভুত ক্ষমতা"! বাজীকরের বিস্তর অর্থ এবং যশোলাভ হইতে লাগিল। একজন স্থানীয় ব্যক্তি একদিন প্রচার করিল যে, সেও বাজীকরের ন্যায় শূকর শিশুর শব্দ শুনা-ইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহুলোক উপস্থিত হইল, কিন্তু সকলেই সেই বাজীকরের গোঁড়া। বাজীকর প্রথমতঃ শূকরশিশুর শব্দানু-করণ করিল, চারি দিক্ হইতে হাততালি পড়িল। তাহার পর স্থানীয় ব্যক্তি আসরে উঠিল, কাপড় দিয়া মুখ ও গাত্র ঢাকিয়া,

শূকরশিশুর শব্দ শুনাইল। চারিদিক্ হইতে "অস্বাভাবিক, কিছুই হয় নাই!" ইত্যাদি বলিয়া সকলে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু, তাহার সঙ্গী দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন কাপড়খানি উঠাইয়া দেখাইল যে, প্রকৃত জীবিত শূকর-শিশুই কর্ণ-মর্দ্দন-হেতু ঐরূপ শব্দ করিতেছে! পাঠক! হিন্দু সমাজে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই তাঁহার আর চক্ষু কর্ণের বিরোধ থাকিবে না। সপত্নীর ঘরে, স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও, হিন্দু সাধ্বীর এইরূপ আত্মসমর্পণ, আত্মবিসর্জ্জন ও আত্ম-বিস্মৃতি সমাজে আজপর্য্যন্তও বড় অমিলন হয় নাই, তবে গ্রন্থ-কার ও তদনুবর্ত্তিগণের প্রসাদাৎ ক্রমে ক্রমে তাহা অমিলন হইয়া, কালে তাহা শুদ্ধ কবি-কল্পিত পদার্থ হইয়া উঠিলেও উঠিতে পারে। সূর্য্যমুখী যখন বলিলেন যে—"কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব, কেন না আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না!" তখন মনে মনে ভাবিলাম, ইনি একজন ইউরোপীয়া আদর্শ রমণী হইবেন, স্বামী অপর রমণীর পাণিগ্রহণ মানসে সামাজিক রীতিমতে ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ইনি বিধিমত ডিক্রি প্রাপ্ত হইয়া, স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র যাইবেন! কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই সূর্য্যমুখী এইরূপ

স্থির করিয়াছিলেন। অতঃপর কুন্দনন্দিনী ফিরিয়া আসিলে, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে বলিলেন, "প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ, তুমি কুন্দকে বিবাহ কর!"—তাই নগেন্দ্র বিবাহ করিলেন। তখন বিভ্রাটে পড়া গেল—এ বিবি দেখিতেছি আর এক রকম কথা বলে!—মহাকবি মিণ্টনের কথা মনে পড়িল। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় কাব্যে স্বর্গচ্যুত, স্বাভাবিক, উচ্চ, আদিম ও আদর্শ নর-নারীর সম্বন্ধ বর্ণনা করিতে গিয়া, ভারতীয় স্ত্রীর সম্বন্ধই সর্ব্বোচ্চ, যুক্তিসঙ্গত ও মনোহর সপ্রমাণ করিয়া, তাঁহার দেবপ্রকৃতি ঈভের বর্ণনায় বলিয়াছেন,—"She shll see god through him"—অর্থাৎ, স্ত্রীর ঈশ্বর দর্শন তাহার স্বামীতেই হইবে। কিন্তু, মিণ্টনও তাঁহার শিক্ষা ও অভ্যাস হেতু হিন্দুর এই স্বাভাবিক ভাব, তাঁহার বর্ণিত আদর্শ নারী ঈভের চরিত্রে, সর্ব্বথা ঠিক রাখিতে পারেন নাই, তাঁহার বর্ণনায় অন্য রকম সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই সমুদয় লক্ষ্য করিয়া, একজন সমালোচক বলিয়াছিলেন, এই আদিম নর-নারী স্বর্গ হইতে লণ্ডন হইয়া আসিয়াছেন! আমরাও সূর্য্যমুখীর কথা পড়িয়া ভাবিয়াছি, এই ইউরোপীয় মহিলাও সেইরূপ কলিকাতা হইয়া আসিয়া থাকিবেন, এবং বাঙ্গালী চিত্রকরের দোষেই তাহার এইরূপ অঙ্গ-বিকৃতি হইয়া থাকিবে! কমলমণি যখন হিন্দু

য়ানি করিয়া সূর্য্যমুখীকে বলিল "তবে কেন বল, আমি কে ? তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা, না হ'লে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন ?" সূর্য্য-মুখী তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং পরিশেষে তিনি যখন পত্রে "স্বামী ত্যাগ করিয়া চলিলাম" ইত্যাদি কথা লিখিয়া রাখিয়া, ভিখারিণীবেশে, দেশে দেশে ফিরিতে গেলেন, তখনই ছায়া মিলাইয়া গেল, বুঝিলাম ইনি কেহই নন্—বিদে-শীয়া কিম্বা স্বদেশীয়া, ইহার কেহই নন্! না হইলেন, তাহাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি নাই। সমাজের ক্ষতি, এইরূপ হিন্দুয়ানি করিয়া বলিয়া দেওয়া যে, সূর্য্যমুখী সমাজের কেহ না হইলেন, সমাজ সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর হওয়া উচিত, হিন্দুরমণী যেরূপ হওয়া উচিত, সূর্য্যমুখী তাহাই, সূর্য্যমুখী হিন্দুস্ত্রীর আদর্শ, তাহার ও কুন্দনন্দিনীর অনুষ্ঠিত কার্য্যই হিন্দুস্ত্রীর স্বামীতে আত্ম-বিসর্জ্জনের আদর্শ, গ্রন্থকার গম্ভীরভাবে ইহা বলিয়া দিয়াছেন, যুবক-যুবতীর মনে ইহা উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়া দিয়াছেন। সমা-লোচক যে কেবল নতশিরে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি আরও গম্ভীরভাবে, দার্শনিকত্বের উপর দার্শনিকত্ব, করিয়া সেই উৎকৃষ্ট কার্য্যের তারতম্য দেখাইতেছেন। নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া, সুখী হইয়াছিলেন, তাহাতে আদর্শ

রমণী কমলমণিকে বলিলেন—"আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস; তখন জানিবে তিনি আজ কত সুখে সুখী" এবং পরে বলিলেন "আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ।" অতএব স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, তিনিও স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন! নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহারই অভিপ্রায় মতে তিনি কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাল্মীকি অথবা ভবভূতির সীতা ও ব্যাসের সুনীতি স্বামীকর্ত্তৃক বাস্তবিক পরিত্যক্তা হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, এতকাল তাহাই হিন্দুরমণীর পতিভক্তি ও আত্ম-বিসর্জ্জনের আদর্শ ছিল। সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর কার্য্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! কিন্তু গ্রন্থকার ও সমালোচক যে ইহাকে কেবল প্রকৃত ও আদর্শ আত্মবিসর্জ্জন বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। সমালোচক গম্ভীর ভাবে আরও দেখাইয়াছেন যে, আত্মবিসর্জ্জন পতি-প্রেমের চরমাবস্থা। সুনীতি ও সীতার ন্যায় সূর্য্যমুখীর প্রেম অসম্পূর্ণ নহে। আবার সূর্য্যমুখী অপেক্ষাও কুন্দ পতিপ্রেমের প্রবলতর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কুন্দনন্দিনীকে পুনরায় পাইয়া নগেন্দ্র আহ্লাদিত হইয়াছিলেন বলিয়া, সূর্য্যমুখী মরিতে পারেন নাই, এবং নগেন্দ্রকে

জন্মের মত ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীকে অনুসন্ধানে না পাইয়া, নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষে ছিলেন বলিয়া, বিরহ-বিধুরা কুন্দ বিষ খাইয়া নগেন্দ্রকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিল, এবং সৎসাহসের সহিত সেই কথা নগেন্দ্রকে বলিল, কেননা নগেন্দ্র তখন দুঃখিত, সন্তপ্ত ও কাতর, আর "কুন্দ আজ বড় মুখরা"। গ্রন্থকারের লিখিবার শক্তি ক্রমে কুন্দনন্দিনীর কথা পাঠকের হৃদয় বিদারণ করে, তাহা দ্বারা কুন্দনন্দিনী আজ দিন পাইয়া নগেন্দ্রকে জর্জ্জরিত করিল। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?" "কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না" সমালোচক ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "কুন্দ নগেন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন।" এই কথাতেই আমাদের আপত্তি। সমালোচকের মতে কুন্দের পতিপ্রেম আদর্শহিন্দুস্ত্রী সূর্য্যমুখীর অপেক্ষাও অধিক। সূর্য্যমুখী আদর্শ হিন্দুস্ত্রী নন, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। (কুন্দনন্দিনীর প্রেম আদর্শ পতিপ্রেম নয়, বাধ্য হইয়া তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব। স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিত, তাহাতেই কুন্দ স্বামীর কথার উত্তর করিত না; আজ আর সে ভাব নাই, আজ "কুন্দ বড় মুখরা"। আজ সে স্বামীর সমকক্ষ হইতেও বড়। স্বামীকে

পরাস্ত করিয়া তাহার দোষের জন্য তাহাকে উচিতরূপ দণ্ডিত করিতে পারিল। কুন্দ উত্তর করিল "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?" ইহার তাৎপর্য্য এই যে তুমি যদি বিনাদোষে ত্যাগ করিতে পার তবে আমি কি তাহা পারি না"। কুন্দ! তুমি যদি হিন্দুস্ত্রী হইতে, তোমার যদি হিন্দুস্ত্রীর ভক্তিজন্য প্রীতির কিছুমাত্রও থাকিত, তাহা হইলে কখনও তাহা পারিতে না। সীতা সুনীতিও বিনাদোষে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা সেই অবস্থাতেও বলিয়াছেন—"জন্মে জন্মে যেন তোমাকেই স্বামী পাই"। তাঁহারা বলিতে পারেন না তোমার দোষে তোমাকে এ জন্মে পরিত্যাগ করিয়া যাই, জন্মান্তরে যেন তোমাকে পাই। যথার্থ স্বামীপ্রেম যাহার আছে তিনি স্বামীতেআত্মসমর্পণ করিয়া আপনাকে আবার স্বামীর সম্মুখ হইতে যথেচ্ছা প্রেরণ করিতে পারেন না। নগেন্দ্র মর্ম্ম পীড়িত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন "কেন তুমি এমন করিলে, তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?" সমালোচক বলেন, "নগেন্দ্রকে দেখিলে কুন্দের মরিতে ইচ্ছা হয় না—এই টুকুতেই কুন্দের প্রেমের মাহাত্ম্য।" নগেন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাহার লালসা কতই প্রবল? আমরা বুঝি, বড় অধিক প্রবল নয়, তাহা হইলে কক্ষান্তর মাত্র

যাইয়াই তাঁহাকে দেখিতে পারিত। নগেন্দ্রও এইরূপই বুঝি-লেন এবং সেই জন্যই বলিলেন "তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?" মুখরা কুন্দ যে উত্তর করিল তাহাতে বোধ হয় যে নগেন্দ্রকে দেখিবার লালসা হইতে কুন্দের অভিমান ও প্রতিহিংসা প্রবলতর হইয়াছিল। সে "বিদ্যুতের ন্যায় মৃদু মধুর দিব্য হাসি (আমরা বুঝি যেন প্রতিহিংসা ক্রমে বিজয়ী-ব্যক্তির বীভৎস হাসি) হাসিয়া" কহিল "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব।" অতএব পাঠক দেখুন, যে এই মৃত্যু বিরহ-বিধুরার কামজ দশম দশাও না। সেই হাসির অর্থ নগেন্দ্র কিরূপ বুঝিলেন তাহার কথায় প্রকাশ পায় নাই; গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে "নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত সেই হাসিহৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।" যেরূপেই হউক নগেন্দ্র জর্জ্জরিত হইলেন, তাঁহার দোষের উচিত দণ্ড হইল। কুন্দেরও দর্শনলালসা পরিতৃপ্ত হইল—সেই অবস্থা দেখিয়া মরিল।' কুন্দের যদি হিন্দুস্ত্রীর ন্যায় পতিপ্রেম থাকিত, তবে এই অবস্থা তাহার কল্পনাতে আসিলে ও সে আর বাস্তবিকই বিষ খাইয়া মরিতে পারিত না। বিরহ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে

নিজের মৃত্যু কামনা করা অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু বিষ খাইয়া মরার কল্পনা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে বেশি ছিল না। আমরা বৈষ্ণব কবি শশিশেখরের একটি গীতে এইরূপ কামনার প্রসঙ্গ দেখি—

"সো যদি মুঝে ত্যজিল কাজ কি ইহ জীবনে,
আন গো সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণক অধিক তোরা কাহে রোয়সি রে সখি!
মরিলে পুন করিবি এহি কাজে।
তনু নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি,
বাধবি ধরি এতনু ব্রজ মাঝে॥
হামারি দোন বাহু লেই সুদিঢ় করি বাঁধবি
শ্যাম রুচি তরু তমাল ডালে।
তোরাহুঁ সব সখিনী মেলি, নিতি নিতি দেখবি
শয়ন ত্যজি আসি উষা কালে।
হৃদয় শিরে বাহুমূলে, শ্যাম নাম লেখবি,
দেওবি গলে তুলসীদল মালে।" ইত্যাদি

তৎপর এক একটী করিয়া অঙ্গের আভরণ সখীগণকে খুলিয়া দিয়া তাহাদের নিকট শ্রীরাধা বিদায় হইলেন; কিন্তু বিষ খাইতে পারিলেন না। আধুনিক কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই সম্পূর্ণ

গীতটির অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু বিষ খাওয়ার কামনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"এখন বাঁচি বাঁচি না বাঁচি না বাঁচি
ন। বাঁচিলে বাঁচি সই
আমার প্রাণ বিরহে, রহে কি না রহে,
আর তোদের কাছে বিদায় হয়ে রই।" ইত্যাদি।

বিরহ যন্ত্রণায়ই যদি বিরহিণীর মৃত্যু হয়, কিম্বা মৃত্যুর ন্যায় মূর্চ্ছা হয়, তাহাতে বিরহিণীর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। তাহাই শ্রীরাধার দশম দশা। যাহা হউক শশিশেখরের মতেও শ্রীরাধা বাস্তবিক বিষ খাইতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না, তাহা কৃষ্ণকমল গোস্বামী আরও একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিয়াছেন যথা—

"আর এক দুঃখ দেখি, মরমে জাগিল সখি,
মৃত তনু করিয়ে দর্শন,
(আমার প্রাণ-বল্লভ গো, পাছে)
সতী-পতি শিবের মত, হয়ে বঁধু উনমত্ত,
মৃত তনু করিয়ে ধারণ,
(কত কষ্টই যে পাবে গো,") ইত্যাদি

শ্রীরাধা বরং অশেষ বিরহ-যন্ত্রণাও সহ্য করিতে পারেন,

কিন্তু তাঁহার প্রাণ-বল্লভ মৃত তনু দেখিয়া যে ক্লিষ্ট হইবেন, কল্পনাতেও তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব তাঁহার মৃত্যু কামনাতেও তাঁহার নিজের চিন্তা অল্প, স্বামীর চিন্তাই অধিক। আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন ক্রমে ক্রমে এই রূপেই হয়। পতিপ্রেমে অতুল্যা কুন্দনন্দিনী বলিল,—"কেন আমি স্বামী দর্শন লালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম? এখন আর কোন সুখের আশায় প্রাণ রাখি?" ইহা তাহার নিজের সুখের চিন্তা ও অনুতাপ, নিস্বার্থ আত্মসমর্পণ ও আত্ম-বিসর্জ্জনের কথা নহে। কুন্দের আর সুখ নাই বলিয়া আজ সে মুখরা হইল, নগেন্দ্রকে যৎসাধ্য দুঃখ দিল, তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া বীভৎস হাসি হাসিল, তাহাতে নগেন্দ্র আজীবন কষ্ট পাইলেন। শ্রীরাধার মৃত্যু কামনায় স্বার্থপরতার গন্ধবাতাসও নাই।

সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর পতিপ্রেম আদর্শ চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং তাহাদের প্রদর্শিত পতিপ্রেম, কল্পিত বিরহের অলৌকিক যন্ত্রণা হেতু, স্বার্থপরতার বীভৎস ক্রিয়া! ইহা যদি আদর্শ আত্মবিসর্জ্জন হয়, তবে সমাজে বাস্তবিকই বিষ-বৃক্ষের রোপণ হইয়াছে! এই বিদেশীয় কলমকরা বিষ-বৃক্ষের ফল প্রথমতঃ কলিকাতা ও তৎচতুঃপার্শ্বে ধরিয়াছিল, এইক্ষণ মফস্বলে পাড়া গাঁয়ে তাহায় ঝুড়ি ঝুড়ি আমদানী দেখিয়া, সমাজ

বাস্তবিকই ভীত হইতে পারে। তাহার পর হীরার বিষ-বৃক্ষ। হীরা যখন বুঝিল যে, সে মরিলে দেবেন্দ্রের কিছুই ক্ষতি নাই, তখন দেবেন্দ্রকে অথবা তাহার কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাওয়ানই স্থির হইল। কিন্তু, নগেন্দ্রকে মারিলে স্বার্থ নাই, কুন্দকে মারিলে স্বার্থ আছে, সুতরাং সে কুন্দকেই বিষ খাওয়াইল, দেবেন্দ্রকে দেখিবার আশা ও সম্ভাবনা বজায় রহিল। অতএব এই আদর্শ আত্মবিসর্জ্জনে হীরা অপেক্ষা সূর্য্যমুখী বড়, সূর্য্যমুখী অপেক্ষা কুন্দ বড়। তবে কুন্দনন্দিনীই গ্রন্থের নায়িকা না হইবে কেন? গ্রন্থকার তাহা বলেন না, তিনি বলেন কুন্দই বিষ-বৃক্ষ। গ্রন্থখানি কিন্তু বিষ-বৃক্ষের বাগান!—নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র, সূর্য্যমুখী, কুন্দ, হীরা, তারাচরণের মাতা, সকলেই বিষ-বৃক্ষ! সকল বৃক্ষই এক জাতীয়, তবে তাহাদের মধ্যে গুণের তারতম্য আছে।

গ্রন্থকার যে সমাজে ছিলেন, তাহাতে বোধ হয় অনেক দারিদ্র্য-গ্রস্ত ভদ্রলোকের কন্যারা দাসীবৃত্তি স্বীকার করিত। সূর্য্যমুখীর স্বামীর গৃহে হীরা তাহাদের প্রধানা।" (৭৮ পৃঃ) তাহার পিতৃগৃহেও তারাচরণের মাতা শ্রীমতী ছিল। হীরা "পদ্মপলাশলোচনা" শ্রীমতীও "বিশেষ রূপবতী" ছিল। শ্রীমতী যদিও কুল-ধর্ম্মানুসারে শীঘ্রই পরপুরুষ লইয়া, তারাচরণকে

ফেলিয়া, বাহির হইয়া গিয়াছিল, তথাপি হীরা "বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে শ্রেষ্ঠা। তাহার চরিত্রে কেহ কোনও কলঙ্ক শুনে নাই। * * সে চিত্তসংযমনে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী।" বোধ হয়, ইহা বেদব্যাস বর্ণিত পদ্মপলাশলোচনেরই গুণ!—ব্যাসের পদ্মপলাশলোচন হরি, এখানে পদ্মপলাশলোচনা হীরা। এই বিষ-বৃক্ষটি শ্রীমতীর অপেক্ষা অধিকতর অলৌকিক, অতএব শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয়। বাস্তবিক গ্রন্থে শ্রীমতীর কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। তারচরণকে একটী নিরাশ্রয় ভদ্রসন্তান বলিলেও হইত, কিন্তু গ্রন্থকারের মতে বোধ হয় যে, তাহা হইলে তারাচরণ কুন্দনন্দিনীর উপযুক্ত বর হইত কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ, তাহা হইলে, বিষ-বৃক্ষের বাগান ও কায়স্থ সমাজের যথাযথ চিত্র অসম্পূর্ণ হইত। হীরা কখনও পাড়ার বাহির হয় হয় নাই (৭৯ পৃঃ), যাহা হউক বৈষ্ণবীর অনুসন্ধানে সে রজনীতে একাকিনী দুশ্চরিত্র মাতাল দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় গেল! গ্রন্থকার বলেন—"অনায়াসে পলাইলে পলাইতে পারিত—কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইল না, কি অন্ধকারে ফুল বাগান মাঝে পথ হারাইল, তাহা বলা যায় না"। (৯২ পৃঃ)। হীরা "চিত্ত সংযমনে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী"। সে বলে, "পরের চোর ধর্‌তে গিয়ে আপনার প্রাণটা চুরি গেল! কি মুখ

খানি! কি গড়ন! কি গলা! এইস্থলে গ্রন্থকার মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রতি হিন্দুর উচিত ভক্তি ও জয়দেবের প্রতি কবির উচিত শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। উপযুক্ত সাধক উপযুক্ত দেবীতে উপযুক্তরূপে তাহা স্বার্থক করিল। মাতাল দেবেন্দ্র বলিল "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ" ইত্যাদি (৯৩) পৃঃ), আরও বলিল "স্মর গরল খণ্ডনং" ইত্যাদি। অতঃপর হীরা দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় মদ্যপানাদি সবই করিল, সেই উৎকৃষ্ট প্রণয়ের প্রতিযোগিনী কুন্দকে বিষ খাওয়াইল। এই মনোহর উপাদেয় চিত্রগুলিতে রং ফলাইতে চিত্রকর বিশেষ শিক্ষা, রুচি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন! গ্রন্থকারের ভাষায় বলিতে গেলে, এ গুলি বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় প্রণয়ের ভেঙ্গান" নহে—যাহাই হউক, সে ত কেবল স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ের "ভেঙ্গান," তাহাতে সীতার ধনুর্ভঙ্গ পণের ন্যায় বিদ্যা-পরীক্ষার পণ ছিল, বিশেষতঃ শিক্ষিত ও গঠিত-চরিত্র ব্যক্তিগণ সে গুলিকে "ভেঙ্গান" বা বিকৃত বলিয়াই জানিত, অশিক্ষিত লোকে এবং স্ত্রীলোকে তাহা বুঝিতও না,—রাজার ঘরের কথা, সুড়ঙ্গ কাটিয়া কাহারও সে গুলির অনুকরণ করাও সম্ভাবনা ছিল না। গ্রন্থকার নাটকাত্মিকা আখ্যায়িকায় তাঁহার নিজস্ব গুলিকে স্ত্রীলোকেরও বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, যে, তাঁহার শিক্ষা এ দেশের কাহারও নিকট নয়—

রেনলন্ডের ন্যায় কোনও মহাত্মার নিকট! রেনল্ড তাঁহার সমাজে যথোচিত লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু, তাঁহার শিষ্যের পূজা, বঙ্গীয় সমাজের ঘরে ঘরে ষোড়শোপচারে আরম্ভ হইয়াছে।

পাঠক মহাশয় এখন আদর্শ পুরুষ নগেন্দ্রের অসাধারণ গুণের কথা শ্রবণ করুন। গ্রন্থকার হীরার ন্যায় নগেন্দ্রের অনেকগুলি অসাধারণ চরিত্র-গুণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১৫২—৫৩ পৃ) কার্য্যে কর্ম্মে তাহার অতি অল্পই পাওয়া যায়। পাঠক হীরার চিত্ত সংযমনের যেরূপ ক্ষমতা দেখিয়াছেন নগেন্দ্রের চিত্তসংযমনের চেষ্টাও সেইরূপ দেখিবেন। নগেন্দ্রের এই শিক্ষা কখনও হয় নাই—তাহার "সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, ভার্য্যার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ ও পরামর্শের বিজ্ঞতা" ইত্যাদির কিছুই ফল নাই—হয় এসকল কথার কথা মাত্র, না হয় মানুষ অদৃষ্ট দোষেই পাপী হয়, নিজ কর্ম্মের ফলে হয় না। নগেন্দ্র সত্যবাদী। অকারণে মিথ্যা কথা কে বলিয়া থাকে? মানুষের প্রকৃতি তাহা নয়, তবে ঠেকায় পড়িয়াও যে সত্য কথা বলে সে সত্যবাদী, যে মিথ্যা কথা বলে সে মিথ্যাবাদী। নগেন্দ্রের মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজন যখন প্রথম হইল তখনই তিনি মিথ্যা কথা বলিলেন। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের "ছায়া দেখিলে তাহার মনের কথা বলিতে পারে, তিনি তাহাকে কি

লুকাইবেন?" সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল "এত অনন্য-মনা কেন?" নগেন্দ্র উত্তর করিল—"মোকদ্দমার জ্বালায়" সূর্য্য-মুখী কমলমণিকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে ইহা মিথ্যা কথা। গ্রন্থ-কার বলিয়া দিয়া ভাল করিয়াছেন, নচেৎ বুঝিতে পারিতাম না যে নগেন্দ্র সত্যবাদী। নগেন্দ্র চিত্তসংযমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাও গ্রন্থকার বলিয়া দিয়া ভাল করিয়াছেন, নচেৎ তাহাও বুঝিতে পারিতাম না, কেননা সেই চেষ্টা থাকিলে অবশ্যই মনের ভাব সূর্য্যমুখীকে বলিতেন, গোপন করাতেই তাহার দমন চেষ্টা না করিয়া পোষণ করার চেষ্টা হইয়াছে। নগেন্দ্র যে তাহা না বুঝিয়া করিয়াছেন এমত নহে কেননা তাহার "বিদ্যা সর্ব্বব্যাপনী" প্রকৃতি তাহাকে বুদ্ধি দিতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ,—সংক্ষেপতঃ তিনি বিচক্ষণ এবং তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিও প্রচুর পরিমাণে ছিল। এসম্বন্ধে বলিলে অনেক কথাই বলিবার আছে, কিন্তু আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই, কেবল চিত্তসংযমনার্থ নগেন্দ্র যে ব্রহ্ম-অস্ত্র অবলম্বন করিয়া-ছিলেন তাহারই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। নগেন্দ্র শেষে অনন্যোপায় হইয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেই অস্ত্রও বৃথা হইল। দেশীয় ও বিদেশীয় ধর্ম্মযুদ্ধ-বিশারদগণ বলিয়াছেন যে মদ্য ইন্দ্রিয়ের লালসাবৃদ্ধি ও ক্ষমতা হ্রাস করিয়া

থাকে। সুতরাং গ্রন্থকার এই ব্রহ্মাস্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা নাও হইতে পারেন, কিন্তু প্রচারক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রচারে তাঁহার শক্তি মহতী ও উপায় মহান্। গ্রন্থকার নগেন্দ্রের পতনের কারণও নির্দ্দেশিত করিয়াছেন—তাহা সচরাচর আর কাহারও পক্ষে সম্ভাবিত নহে। তাহা এই—"যদি তাঁহার (নগেন্দ্রের) কপালে এত সুখ না ঘটিত তবে তিনি কখনই এত দুঃখী হইতেন না।" অর্থাৎ তাহার কপালে এত দুঃখও থাকিত না। ইহার যুক্তিও গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"যাহার যাহাতে অভাব তাহার তাহাতেই লোভ"। নগেন্দ্রের একটী মাত্র অভাব ছিল (১৯৫ পৃ)—সূর্য্যমুখীর সকল গুণ থাকিলেও তাহার একটী মহদ্দোষ ছিল যে তিনি কেন চিরকাল ত্রয়োদশবর্ষীয়া থাকিলেন না? অসাধারণ গুণ সম্পন্ন অতি সুশিক্ষিত নগেন্দ্রের উচ্চ ও আদর্শপ্রেমের পক্ষে তাহা বড়ই অভাব। সূর্য্যমুখীর বিংশতি বৎসরের অধিক বয়সে যখন নগেন্দ্রের বয়স ২৫ বৎসরের কম, তখন তিনি পদ্মপলাশলোচনা রূপবতী ত্রয়োদশবর্ষীয়া হীরাকে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু সেই বয়সে সে অভাব বোধ হওয়া স্বাভাবিক না। অতএব হীরার মত তিনি চিত্তসংযমন শিখিবার অবসর পান নাই। পরে তাহার ভগিনী কমলমণি কুন্দকে দেখিবা মাত্র "গরম জলের টবে ফেলিয়া" (১৭ পৃ) পরিষ্কার

করিয়া সাজাইয়া বলিলেন "যা এখন দাদাবাবুকে প্রণাম করিয়া আয়।"

তখন কুন্দকে দেখিয়া নগেন্দ্র তাহার প্রিয় সুহৃৎ হরদেব ঘোষালের নিকট লিখিলেন (১৮পৃঃ) "বল দেখি কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? * * * কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম——তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়।" তখন সূর্য্যমুখীতে সেই সৌন্দর্য্যের অভাব। অতঃপর নগেন্দ্রের সেই "নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব" সূর্য্যমুখী লোষ্ট্র-বৎ পরিত্যক্তা হইলেন। নগেন্দ্র অধীর, উন্মত্ত, তাহার জীবন সংশয়। অগত্যা কুন্দনন্দিনীর সহিত তাহাকে বিবাহ দিয়া, বিবাহের চতুর্থ দিবসে সূর্য্যমুখী বাহির হইয়া গেল। অমনি কুন্দ ও পরিত্যক্তা—নগেন্দ্র আবার পাগল হইলেন। নগেন্দ্রের চরিত্রের সামঞ্জস্য করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ একটী পুরুষ সংসারে নাই—হইতে পারে কিনা জানি না। গ্রন্থকার বলেন—পারে, এবং নগেন্দ্রের চরিত্রের সামঞ্জস্য করি-তেও এই গ্রন্থেই যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে প্রণয়ের দার্শনিক তত্ত্ব ও কবি বর্ণিত প্রণয়ের

ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। এইস্থলে নগেন্দ্র বলিতেছেন—কুন্দনন্দিনীর প্রতি তাঁহার "কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজ পনর দিবস মাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম?" হরদেব ঘোষাল তাঁহার দর্শনতত্ত্ব বলিলেন,—"ইহা রূপজ মোহমাত্র—কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি, বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে।" সুতরাং এই গ্রন্থের নায়ক নায়িকার মধ্যে যে ভাব গ্রন্থকারের মতে তাহা রূপজ মোহমাত্র, ইহা প্রণয় নহে। তবে ইহা প্রণয়ের ভেঙ্গান কিনা? লক্ষণ মতে দেখি ইহা রূপজ মোহও না। গ্রন্থকার বলেন (১৬৪পৃঃ) "রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইবে, এবং পৌনঃপুণ্যে হ্রস্ব হয়।" এই নায়ক নায়িকার প্রণয় কিন্তু সেরূপ নয়। নগেন্দ্রের সেই "অনিন্দিত গৌরকান্তি স্নিগ্ধ জ্যোতিস্বরূপিণী" ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরী কুন্দনন্দিনীকে তিনি যখন প্রথম দেখিয়াছিলেন, তখন এই রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান হইল না। তিনি ভৃত্যকে কি কারণে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিলেন! মৃতপ্রায় বৃদ্ধের সকল কথা শুনিলেন, দেখিতে দেখিতে কুন্দের পিতা মরিলেন। নগেন্দ্র কোন সাহায্য করিতে ইচ্ছাও করিলেন না, নিজে নিকটে গেলেন না,

ভৃত্যকে ডাকিলেন না, প্রাচীন হিন্দু ঘরেই মরিল, আঁধার ঘরে সেই জনশূন্য স্থানে সেই জ্যোতিস্বরূপিণীকে মরার গায় রাখিয়া নগেন্দ্র অনায়াসে গ্রাম আবিষ্কার করিতে গেলেন—দেখা দিলেন না। ইহার কারণ বোধ হয় এই—Shakespeare (সেক্ষপীয়ার) বলিয়াছেন, Comming events cast their shadows before. তাহারই সন্দিগ্ধতা দোষ-দুষ্ট অনুবাদ "ছায়া পূর্ব্বগামিনী" এই শীর্ষক পরিচ্ছেদে সেই অবস্থায় অগ্রে কুন্দনন্দিনীর তন্দ্রা ও স্বপ্ন হ'বে, তাহার মাতার সহিত নগেন্দ্রকে ও হীরাকে আকাশ হইতে অবনত চন্দ্রমণ্ডলে দেখিবে। তাহা না হইলে তিনটী পরিচ্ছেদের শিরোনাম, অর্থাৎ "ছায়া পূর্ব্বগামিনী," "এই সেই" এবং "পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে ?" কোথায় পাওয়া যাইত ? এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে এই অলোকীক ও অস্বাভাবিক ঘটনার কোনও ব্যবহার অথবা প্রয়োজন দেখা যায় না। কুন্দ যে মাতার অনুজ্ঞার কোন অংশ অনুসারে কোন কার্য্য করিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। তবে আর একবার কুন্দ মাতার আদেশ পাইয়াছিল, পাইয়াই তাঁহার সহিত নক্ষত্রলোকে চলিয়া গেল, তথায় যাওয়ার পথ—বিষপানে আত্মহত্যা। শাস্ত্রকারগণ ইহাকে মহাপাপ বলিয়াছেন, কিন্তু "কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং"। ধর্ম্মের গতি

অতি সূক্ষ্ম, শাস্ত্রের পথ কুটিল, দর্শনের পথও অদৃশ্য,—কোথায় বা কারণ, কোথায় বা কার্য্য। দর্শন ঘোরাইয়া ফিরাইয়া বলিলেন, পুণ্যের কারণ ধর্ম্মানুষ্ঠান, নক্ষত্রলোক প্রাপ্তির কারণ পুণ্য, পুণ্য কেহ দেখে না, সংসারে পাপ-পুণ্য অথবা স্বর্গ নরক দেখা যায় না। কবি প্রদর্শিত পথ সহজ, দেখা যায়, তাহাতে শান্তিলাভ নিশ্চিত ও তৎক্ষণাৎ। সে যাহাই হউক, নগেন্দ্রের মোহ তখন এককালীন প্রবল হইল না। ইহার আরও একটী কারণ আছে—কমলমণি তখন পর্য্যন্ত কুন্দকে "সহসা গরম জলের টবে ফেলিয়া গায় ছোপ্ দেয়নাই" এবং কোর্টসিপের জন্য তাহাকে নগেন্দ্রের নিকট পাঠায় নাই। তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, কমলমণি তাহা করায় পরই বা সেই মোহ এককালীন প্রবল হইল না কেন? তাহারও বিশেষ কারণ আছে। কুন্দ তখন কুমারী, তাহার সহিত তারাচরণের অগ্রে বিবাহ হওয়া চাই; নচেৎ বিধবা বিবাহের "ভেঙ্গান"টা হয় না। চারি বৎসর পর্য্যন্ত সেই রূপজ মোহ উপস্থিত হইয়াও সম্পূর্ণ বলবান হইল না। পরে পরদারা গুণসম্পন্না হইয়া যখন পুনর্ব্বার কুন্দ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখনই সেই রূপজ মোহ সম্পূর্ণ বলবান্ হইল। কথিত আছে, জিজ্ঞাসা হইয়াছিল সুন্দর কি? তাহার উত্তর হইয়া-

ছিল—পরের রূপ। এইরূপে যাহা চারি বৎসরে সম্পূর্ণ বলবান হইয়াছিল, তাহা পৌনঃপুন্যে নহে—অন্য যে কোন কারণেই হউক,—চারি দিনেই সম্পূর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা রূপজ মোহও না গুণজ প্রণয়ও না প্রণয়ের ভেঙ্গানও না, তবে কি? এই বৃদ্ধি ও ক্ষয় কিছুই তাহার স্বভাবের গুণে নহে, কেবল গ্রন্থকারের ঠেঙ্গানের বলে—অতএব ইহা প্রণয়ের "ঠেঙ্গান"। কথায় বলে গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করে। সমাজে এই ঠেঙ্গানের যেরূপ শক্তি দেখা যাইতেছে, হিন্দুর ঘরে ঘরে সেবা দাসীর পরিবর্ত্তে শীঘ্রই বিবির "ভেঙ্গান" পাওয়া যাইবে; না হয়তঃ আত্মহত্যার জন্য আফিমের দর বাড়িয়া যাইবে। যাঁহারা এ বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, আনুপৌর্ব্বিক অবস্থার অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, হিন্দু সমাজে এই কয় বৎসরে এই শুভানুষ্ঠানের কি পরিমাণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আর একটী মাত্র চরিত্রের সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। কমলমণি। গ্রন্থকারের মতে কমলমণি একটী রমণীরত্ন, আমরাও বলি তাই; কিন্তু স্ত্রী রত্ন বলিব কিনা তাহাই ভাবিতেছি। এইটী বড়ই মনোহর পদার্থ। কমলমণিকে ভালবাসিবে না, এমন যুবক আছে ইহা বিশ্বাস করি না। গ্রন্থ-

কারের প্রশংসা বা নিন্দা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সমালোচনার নাম নিয়া গ্রন্থের প্রতিলিপি উপস্থিত করাও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু দোষের সমালোচনায় দোষ আছে; অনেকের মনেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা। অথচ বিষ-বৃক্ষের ন্যায় গ্রন্থের কেবল দোষ উল্লেখ করিয়া বসিয়া থাকিলে, সমালোচককে অনেকেই মূর্খ বলিতে পারেন। এ দিকে প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এইস্থলে দুই চারি কথা বলিলেও বলিতে পারি। কমলমণির ন্যায় চিত্র ইদানিক বঙ্গের আর কাহারও তুলিকা হইতে হয় নাই, হবে কিনা, যিনি বঙ্কিমকে তাহার নিকট নিয়াছেন তিনিই জানেন। তিনিই বলিতে পারেন, এ দরিদ্র দেশে এমন রত্ন আবার কত দিনে হইবে। গ্রন্থ পড়িয়া কমলমণিকে আমরা দেখিতে পাই, সে যাহা করে তাহাও দেখিতে পাই, যাহা বলে তাহাও শুনিতে পাই, শুনিতে বড়ই মিঠা লাগে, আরও শুনিতে চাই, সে চুপ করিলে মনে বড় ব্যথা পাই। যে পর্য্যন্ত বলিয়াছে, তাহারই বারম্বার আবৃত্তি করি। কমলমণি আর কথা কহিবে না, আর অধিক কহিতে পারে না—তাহার জীবনীশক্তি, বঙ্কিম-বাবুর প্রতিভা, এ জন্মের মত অন্তর্ধান করিয়াছে। এই কথা স্মরণ করিলে আর দুঃখের অবধি থাকে না, তখন মনে

হয় এমন কামধেনুর নাথিও ভাল। পাঠক মহাশয় আরও কিছু ক্ষমা করুণ, মাটীর উপর যতদিন থাকিব হাসি কান্না ততদিন একরূপই থাকিবে; কিন্তু কর্ত্তব্য কেবল যখন তনখই। কর্ত্তব্যানুরোধে এত কথা বলিয়াছি, আরও বলিবার বাকি আছে। অনেক ভাবিয়াছি, ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, এই রমণী রত্নটীকে হিন্দুর স্ত্রীরত্ন বলিতে পারি না। হিন্দুর স্ত্রী, তাহার গৃহলক্ষ্মী—আরও অনেক উচ্চ দরের সামগ্রী।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার চাঁচা ছোলাতে মসৃণতা হেতু চতুর্দ্দিকের জ্যোতি গ্রহণে নিজকে অধিক উজ্জ্বল না দেখাইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বভাব ও আভ্যন্তরীক স্নিগ্ধ জ্যোতির গুণে সে হিন্দুর আঁধার ঘরের অতি অল্প খরচের সর্ব্বকর্ম্মোপযোগী মনোহর প্রদীপ। সেই রত্নের সহিত এই রত্নের বিনিময় করিতে পারি না—তাহা হইলে দরিদ্র ভারত কাঙ্গাল হইবে। কিন্তু ভারতের কাঙ্গাল হওয়া যেন বিধাতার নির্ব্বন্ধ। আমরা ইচ্ছা করি, আর নাই করি, এই রত্ন বুঝি আর বাঙ্গালীর ঘরে থাকিবে না। বাঙ্গালী বড়ই অনুকরণপ্রিয়, বাহ্যদৃশ্যেই ভুলিয়া যায়। যে গুণে যে দ্রব্যের উৎকর্ষ, সেই গুণ অনুকরণ করা বড় শক্ত। কেমিক্যাল সোণা, সোণার মত দেখায়, কিন্তু সোণা নহে। সাহেব বিবি হওয়া বড় কঠিন, কিন্তু হেট্,

কোট, গাউন পরিয়া তাহাদের মত দেখান সহজ, কাজে কাজে আমরা আমাদিগকে তাহাদের মত দেখাইয়াই অন্যকে ও নিজকে প্রতারণা করি। অনেক যুবক যুবতী সাহেব বিবির অনুকরণ করিয়া মনে করে তাহারা সভ্য ও সুখী হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধঃপাতে যাইতেছে। আমরা পরিচ্ছদ অনেক রূপ দেখি, কিন্তু হিন্দু স্ত্রীর লজ্জাশীলতার ন্যায় কোন পরিচ্ছদই মনে ধরে না। সেই পত্রাবরণের ভিতর দিয়া স্বাভাবিক নিয়মে যে কিঞ্চিৎ রূপ ফুটিয়া বাহির হয়, তাহার অলৌকীক মনোহারিত্ব। তাহা হইতেপ্রণয় পরিমল আপনি ছুটিয়া আসিয়া গায় পড়ে না—অলক্ষিত ভাবে সমীরণ তাহা হরণ করিয়া অলক্ষিত ভাবে প্রণয়াজনকে দেয়। হিন্দু স্ত্রী স্বভাবের সেই মৃদু স্নিগ্ধ পরিমলাধার গোলাপ, কমলমণি শিল্পজাত সুবাসিত জল-পূর্ণ গোলাপ-পাস। অল্প সঞ্চালনেই কমলের মুখে প্রণয়ের ঝরণা হয়, যথা—"তখন কমলমণি শ্রীশকে একটী কিল দেখাইল। কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া ছোট হাতে একটী কিল দেখাইল। * * * * রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখ চুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখ চুম্বন করিল। * * * শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল, শ্রীশ সেই কলম লইয়া

পশ্চাৎ হইতে গিয়া কমলের কপালে একটী টিপ কাটিয়া দিলেন।

তখন কমল হাসিয়া বলিলেন,—"প্রাণাধিক আমি তোমায় কত ভালবাসি" এই বলিয়া, কমল শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন, সুতরাং টিপের কালি সমুদয়ই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।" এস্থলে কমলমণি যাহা করিল, তাহা বোধ হয় হিন্দু স্ত্রীর অসাধ্য। সে কোর্টসিপ জানে না, অন্যকেও শিখাইতে পারে না। কমলমণি জানে এবং কুন্দনন্দিনীকে দেখিবা মাত্র গরম জলের টবে ফেলিয়া, ছোপ দিয়া ধৌত করতঃ সুমার্জ্জিত করিয়া দাদাবাবুকে প্রণাম করিতে পাঠায়, স্বামীকে প্রণাম করিতে নিষেধ করে। পাঠক মনে করিবেন না যে হিন্দু যুবতী স্ত্রীর স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) নাই—তাহা আছে কিন্তু সামাজিক প্রথা ও লজ্জার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহার প্রসারণ হয় না।

দৃশ্য কাব্যের শক্তি সকল সভ্য দেশেই অনুভূত হইয়াছে। আমাদের যতটুকু সভ্যতা রহিয়াছে অথবা লাভ করিয়াছি তাহা দ্বারা আমরা সেই শক্তির অনুভব করি। নীলদর্পণের শক্তি এখনও দেশে জাগরূক। নাটকাত্মক আখ্যায়িকাও অনেকাংশে দৃশ্যকাব্য। সমাজে ইহার প্রভূত শক্তি। সেই

শক্তির প্রয়োগে সমাজের প্রচুর উপকার ও অপকার সাধিত হইতে পারে। সামান্য দুঃখের বিষয় নহে যে বঙ্কিম বাবুর প্রতিভা একটিও বর্ত্তমানা সীতা, শকুন্তলা অথবা মালবিকাকেও এইরূপ উজ্জ্বল জীবন্ত বর্ণে দেখাইয়া গেল না। শকুন্তলা আজকাল সুসভ্য ফরাঁসদেশের অভিনয় গৃহে বিরাজ করিতেছেন, সামান্য দুঃখের বিষয় নহে যে, তাহার পিতৃগৃহ শূন্য, মাতৃভূমি উজাড়, তথায় তাঁহার সন্তান সন্ততি একটিও নাই। কমলমণির ন্যায় রমণীরত্ন পরদেশে আসিয়া দুদিনও ভাল থাকেনা। পূর্ব্বের নিয়ম জানিনা, কিন্তু উপরোদ্ধৃত অংশ বঙ্কিমবাবুর পূর্ব্বে বাঙ্গলা সাহিত্যের রীতি বিরুদ্ধ। কাব্যনির্ণয় রচয়িতা বলেন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নিন্দনীয় বিষয় দৃশ্য কাব্যে বর্ণনযোগ্য নহে। হীরা ও দেবেন্দ্র প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া উপরোদ্ধৃত অংশ ও সংস্কৃতানুকরণে হইয়াছে, এমত বোধ করিনা। সম্ভবতঃ ইহা বিদেশী প্রথারই অনুকরণ। পাঠক মহাশয় বলিতে পারেন যে তাহা হইলেই ক্ষতি কি? ক্ষতি আছে, কিন্তু তাহা দেখাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়।

বঙ্কিম বাবুর প্রতিভা অভিনেয় আখ্যায়িকাতে প্রকাশ্যে চুম্বন ও আলিঙ্গন প্রণব করিয়া সন্তানকে ধানদুর্ব্বা দিয়া মায়ের

আশীর্ব্বাদ দিলেন—"ধানের ন্যায় একটিতে সহস্রটি হও, দুর্ব্বার ন্যায় অজর, অমর হও, ও শাখা প্রশাখাতে বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি পাও"। মায়ের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হয় নাই। এই সন্তানের বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি পাঠক সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবেন, দেখাইতে চাহি না। যদি নিতান্তই দেখাইতে হয় তবে অনুরোধ করি, একবার কবিবর শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র সেন মহাশয়ের কুরুক্ষেত্র কাব্য পড়ুন, পড়িয়া চুম্বন আলিঙ্গনের সংখ্যা করুন। বিবি উত্তরা গর্ভবতী, তাহার মনোবাসনা প্রাণনাথ অভিমন্যুর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

"কানন কপোত, বন কপোতিনী মত,
মুখে মুখে বুকে বুকে থাকি অবিরত"

সেই উত্তরার মুখ, তাহার পিতা মেস্তর অর্জ্জুন, মাতুল—শ্বশুর মিস্তর শ্রীকৃষ্ণ, পিতা লর্ড বিরাট, প্রভৃতি কতবার চুম্বন করিলেন পাঠকমহাশয় কেবল তাহারই সংখ্যা করুন। অভিমন্যু কর্ত্তৃক মুখচুম্বনের সংখ্যা করিতে বলি না, সে বড় পরিশ্রমের কাজ। বিবি উত্তরা শ্বশুর ও মামাশ্বশুরকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করেন, এক একবার সকলের গলায়ই স্বর্ণোপবিত হইয়া দুলিতেছেন, আবার অভিমন্যুর অঙ্গেত উত্তরীয় হইয়াই থাকেন। লর্ডবিরাট রসিকতা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে সুলোচনার

ছুই গালে চড় মারিতেছেন। নূতনত্বের প্রয়োজন হেতু বটতলার সরস্বতীর যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, অতঃপর কাশীদাসকে আর বড় দেখিতে পাওয়া যাইবেনা, তিনি অমর হইলে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তাঁহার মহাভারত দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—পয়ারের দোষেও কতকটা বটে, দেশটাকে "পয়ার প্লাবিত" করিয়া রাখিয়াছিল। শত সহস্র বৎসর পরাধীন থাকিয়াও যে হিন্দুর সমাজ রহিয়াছে, সে কেবল রামায়ণ মহাভারতের দৌরাত্ম্য। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগুলি এখনও সকল করিয়া সেইগুলি শুনে। সরকার দোকানদারগুলি এখনও সুর করিয়া বলে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান"। যাহা হউক ভবিষ্যৎ দৃষ্টি করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যায়। শিক্ষিত যুবক যুবতী যখন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা হইবে, উপাদেয় পাঠ্যপুস্তকগুলির গুণে শিক্ষাকার্য্য যখন পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হইবে, তখন এই হতোম পেঁচার জোড়া দেশ ছাড়িবে। সে শুভদিন আসিলে বাঁচি—হাড়ে বাতাস লাগে। তা হইলেও ইহাদের ছা, ডিমগুলি নাকি অনেক দিন থাকে, সেই আশঙ্কা। কিন্তু তাহারও প্রতিকার চেষ্টা এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। দৃষ্টান্ত না দেখাইলে বোধ হয় পাঠক ছাড়িবেন না। "আস্তীকস্ত মুনের্ম্মাতা" ইত্যাদি—শ্রীকবিবল্লভ বাঙ্গলাতে বলিলেন "নাম

মনসা দেবী শঙ্কর দুহিতা, জরৎকারু মুনিপত্নী আস্তীকের মাতা"।

"শ্রীবল্লভের উৎকৃষ্ট কাব্য মহাভারত অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহাতে অতি হৃদয়গ্রাহী উচ্চঅঙ্গের প্রণয়ের করুণ রসাত্মক বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু মহাভারতের কোন অংশ কোনরূপ বিকৃত হয় নাই। তথাপি কবির গুণে এবং নারায়ণ দাসের স্বরলালিত্য অথবা আর যে কোন কারণেই হউক, বঙ্গের হিন্দু মাত্রেই মনসা দেবীর পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল পুরাতন কাব্যে প্রণয়ের বৈচিত্র নাই। দেবেন্দ্র ও হীরার প্রণয়কাহিনী না থাকিলে "বিষবৃক্ষ" আর কত বড় গ্রন্থ হইত? রোহিণীর কুৎসিত প্রণয় ছাড়িয়া দিলে "কৃষ্ণকান্তের উইল" গ্রন্থই হয় না। চন্দ্রশেখরের স্ত্রীর ইংরেজ সংসৃষ্ট কাহিনী ছাড়িয়া দিলে, প্রতাপের ঐতিহাসিক চরিত্রের স্ফুরণ হয় না। সেইরূপ বঙ্কিম বাবুর প্রণয়াখ্যায়িকার আদর্শানুকরণে আজ এই পূজনীয়া মনসাদেবীর বিড়ম্বনা দেখুন। তিনি কুরুক্ষেত্র কাব্যের উপ-নায়িকা, শ্রীকৃষ্ণ উপনায়ক। নূতনত্বের অনুরোধে ইনি জরৎ-কারুমুনির স্ত্রী না হইয়া দুর্বাসা মুনির বিবাহিতা স্ত্রী। শ্রীকৃষ্ণকে সে উপপতি করিতে চায়! কারু মূর্চ্ছিতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে "অঙ্কে লইয়া" আনার সময় যেরূপ "লাগিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ,

লাগিয়াছে হায়! কারু হৃদয়ে হৃদয়" সেই রূপ প্রেমালিঙ্গন চায়। সুভদ্রা বলিলেন "এ তীব্র কামনা কেন, হায়? মানবের তরে?" পরে সবিশেষ শুনিয়া—

"চমকি কহিলা ভদ্রা—সেকি কথা সুচরিত্রে?"
ঋষিপত্নী তুমি, তবপতি শ্রেষ্ঠতম।"

"জরৎকারু উচ্চহাস্যে" কহিল, "আগুণ ঋষির মুখে! পতিমম সেইজন"—কারুর দুঃখের কারণ এই যে অস্পৃশ্যা অনার্য্যা বলিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিতে পারেন না; আড়ালে সরিয়া যান।

কারু বলিল—

"ভগিনি! বলিতে আর পারিলেনা পাপিনীরে
গেল সুভদ্রার মুখ লজ্জায় ছাইয়া
নানা ভগ্নি! পাপিনী যে তাকে আমি বেশি ভাল বাসি!"

জরৎকারু শপথ করিল—

"আর নাগবালা আমি দংশিয়া তাহার বুকে
মারিব, মরিব তাকে এ বুকে লইয়া।"

এই বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। গীতাময় নির্লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হইলেন।

"ছুটিলা, ডাকিলা কৃষ্ণ বারেক অস্ফুটে—"কারু!"
গেল বামা উল্কা যেন আঁধারে মিশিয়া।"

কারু এইরূপ ভালবাসা চায় না। সেত তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাসুকীকেও আলিঙ্গন করিয়া থাকে।

"ছুটিয়া রমণী যেন আনন্দে অধীরা,
পড়িল বাসুকী বক্ষে গলা জড়াইয়া।"

বর্ব্বর বাসুকীও দুর্ব্বাসা এবং আমাদের অপেক্ষা সভ্য, সে কারুকে দেখিয়া—

আবার আবার স্নেহে চুম্বিয়া বদন,
স্নাতফুল্ল নীলোৎপল, জিজ্ঞাসিল ধীরে—
কেমন আছিলি কহ ?"

ধীরে অধোমুখী বামা উত্তরিলা হাসি—"আছিলাম, আছি আশ্রিত পাদপচ্যুত লতিকার মত" (৩৪ পৃঃ)।

অর্থাৎ দুর্ব্বাসা তাহাকে "ডাইবোর্স" করিয়াছেন, অথবা তাঁহার সহিত তাহার "লিগেল সেপারেশন" হইয়াছে।

টড্ সাহেব বলিয়াছেন,—যামদগ্নি হইতে মহারাষ্ট্রীয় পেশওয়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ চিরকাল ক্ষত্রিয়দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া, তিনি পুরাণ হইতে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। নবীনবাবু টড্ সাহেবের মত ও বঙ্কিমবাবুর পথ অবলম্বন করিয়া এই বিরোধে ব্রাহ্মণ ও অসভ্য নাগজাতির মিলন

করিতে মনসাকে দুর্ব্বাসার সহিত বিবাহ দিয়াছেন। জরৎকারুও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার মনসা-গর্ভজাত পুত্র আস্তীক সর্প-হত্যা যজ্ঞে নাগগণকে রক্ষাও করিয়াছিলেন। তথাপি নবীনবাবু যে মনসাকে দুর্ব্বাসার সহিত বিবাহ দিয়া উত্তরা ও অভিমন্যুর প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনসা ও কৃষ্ণের প্রণয়ের প্রসঙ্গে ন্যূনাধিক অর্দ্ধাংশ গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় যেন বিষ-বৃক্ষ ইত্যাদি গ্রন্থে প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। এই অনুকরণে ব্যাসেরত কথাই নাই, টড্ এবং বঙ্কিমেরও যথেষ্ট দুর্গতি হইয়াছে। এই সকল প্রণয়াখ্যায়িকার তলে নীতিরত্ন থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোকই তাহা ধরিতে পারে না। দেবেন্দ্র ও হীরা সমাজের কেহ নয়, কমলমণিও সমাজের কেহ নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও মনসা এবং উত্তরাও কি সমাজের কেহ নয়? উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে "জরৎকারু" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন। জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ। কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে দারুণ শরীরকেও ক্ষীণ করিয়াছিলেন, এইজন্য মনসা এবং তাঁহার স্বামী উভয়েরই এই নাম হইয়াছিল। সেই মনসার কৃষ্ণপ্রেমের এই বীভৎস চিত্র কমলমণি অথবা কুন্দনন্দিনী কেন, চিত্তসংযমনে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী হীরার প্রেমের চিত্রকেও পরাস্ত করিয়াছে কিনা ভাবিয়া দেখুন।

কোথাকার ভূতের প্রধান শিব, মনসা তাহার মানস কন্যা, সে আবার নাগমাতা বিষহরী? এ সকল "মিথলজি", সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনার উপর কল্পনার প্রকাণ্ড অট্টালিকা। দার্শনিক ঐতিহাসিক দর্শন লিখিতে বসিলেন। অনেক গবেষণার পর স্থির করিলেন যে, শিব পার্ব্বতীয় নাগ-জাতির একজন রাজা। ইহাঁর সৈন্যেরা নানারূপ বীভৎস-বেশে সাজিয়া গদাযুদ্ধ করিত, এবং ভূত নামে অভিহিত হইত। ইহাদের সৈনিক পতাকায় নাগ থাকিত এবং কতকগুলি তীরন্দাজ ছিল, তাহারা তীরের মুখে হলাহল দিত। এখন পর্য্যন্তও অসভ্য শিকারিগণ বাঘ মারিবার জন্য সর্প-বিষ দিয়া তীর পাতে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শিবের রাজত্ব সময়েও রক্তের সঞ্চালন-বিধি জানাছিল। আরও জানাছিল যে, সর্প-বিষ রক্তে উজায়। যেরূপ পতাকায় থাকিত, সেইরূপ রাজার স্কন্ধে ও শিরে নাগাকৃতি থাকিত, এই সকল কারণে এই জাতিকে নাগ বলিত। এই শিবরাজার কন্যা মনসা। তাহার আর এক নাম জরৎকারু অথবা কারু। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ আদিম জাতিতে আধুনিক সুসভ্য জাতির কোন কোন প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ স্বামীর নামে স্ত্রীর আর এক নাম হইত যথা মিসেস এলেকজেণ্ডার। বড় দুঃখের বিষয় এই যে, ভারত-

বর্ষে এই উৎকৃষ্ট প্রথা কিরূপে লুপ্ত হইল সম্যক জানা যায় না। মনসার দুইটী নাম থাকাতে ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় নামটী তাহার স্বামীর নামের নাম। কিন্তু তাহাও ভ্রম। মনসার স্বামীর নাম জরৎকারু নহে, কিন্তু দুর্ব্বাসা। দুর্ব্বাসার সহিত তাহার যেরূপ ব্যবহার তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে "ডাইবোর্স ও লিগেল সেপারেশন" ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই কারণেই দুর্ব্বাসার নামে মনসার নাম হইল না। বোধ হয় সেই হইতেই স্বামীর নামে স্ত্রীর নাম প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। মনসার আর এক নাম বিষহরী ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত আসক্তি ছিল, হইতে পারে, এই প্রসঙ্গেই তাহার হরি নামের কারণ। মনসা বলেন, ইহা স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ভ্রাতা-ভগ্নি-ভাব। শ্রীকৃষ্ণের কথাই সত্য হওয়া সম্ভব। ক্ষেত্রজ সন্তানের নাম চিরকাল মাতৃবংশের নামে হইত। বোধ হয় এইজন্যই মনসা যদুমাতা না হইয়া নাগমাতা হইয়াছেন। যাহা হউক এই মতের অভ্রান্ত প্রমাণ নাই; চুম্বন কাব্যে এই দুইটী নামেরই উল্লেখ নাই। বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে, তাৎকালিক সমাজের অবস্থা জানা যাইতে পারে না। যদিও এই নাগজাতি "বর্ব্বর" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তথাপি দেখা যায় যে তাহারা আধুনিক সভ্য জাতিগণ হইতেও সুসভ্য।

আধুনিক সভ্যেরা যুবতী কন্যা, ভগ্নী, পুত্রবধূ, ভাগিনেয়ের স্ত্রী প্রভৃতির বড়জোর হস্তলেহন করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এ সম্বন্ধে নাগদিগের সভ্যতা দেখিয়াই বিস্মিত হইতে হয়। সে সময়ের সামাজিক চিত্র দেখিলে বোধ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ গীতা না বলিলেও পারিতেন। এখনকার মত তখন অনেক কৃষ্ণ ও অনেক ব্যাসই ছিল। তথাপি—

"দাঁড়াইয়া দূরে বট বিটপী ছায়ায়।"

ব্যাস শিষ্যের হস্তে গীতা দিলেন, এবং বলিলেন,—

"গিয়া তুমি পাণ্ডব শিবিরে,
সুভদ্রার করে গ্রন্থ কর সমর্পণ।"

সুভদ্রা সুলোচনাকে গীতার উপদেশ প্রদান করিলেন, পরে অভিমন্যুকে সম্পূর্ণরূপ উপদেশ করিয়া বলিলেন,—

"বুঝিলে কি অভিমন্যু।—অব্যক্ত ব্রহ্মপরম,
অবলম্বি স্বপ্রকৃতি করেন বিশ্ব সৃজন।
কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত তাহার প্রকৃতি পায়," ইত্যাদি।

অতএব দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণও অনেক, ব্যাসও অনেক। বর্ব্বর বাসুকীও যুবতী, পরিত্যক্তা, বিরহবিধুরা ও প্রেমোন্মাদিনী কনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া অনায়াসে নিষ্কাম চুম্বনালিঙ্গন করিতে পারিত। সেই এক গীতার সময়

ছিল, আর এই এক গীতার সময় পড়িয়াছে। চুম্বনালিঙ্গনের মাহাত্ম্যে বঙ্গীয় কবিগণ একরূপ বিহ্বল হইয়াছেন। পুরুষের কথা আর অধিক বলিব না, পাঠক! শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবীর প্রণীত "হাসি ও অশ্রু" কাব্যে "দুটি চুম্বন ও আলিঙ্গন" পড়িয়া বঙ্কিম বাবু ও নবীন বাবুর ধন্যবাদ করুন্। ধন্যবাদের যোগ্য অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাহাতে পাছে চটিয়া যান, সেই জন্য লক্ষণ তর্পণের ন্যায় এক বাক্যে সকলকে জলাঞ্জলি প্রদান করুন্। অতএব পাঠক মহাশয় দেখুন প্রকৃত কবিত্বই দর্শনের ভিত্তি। বড় দুঃখের বিষয় এই যে পূর্ব্ব বঙ্গের গৌরব পলাসী যুদ্ধের রচয়িতা নবীন বাবুর এই চুম্বন কাব্যকে মৌলিক গ্রন্থ বলিতে পারিনা। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার উত্তরা বিষবৃক্ষের কমলমণির "ভেঙ্গান"। কেবল তাহাই নহে বিষবৃক্ষের "মহাসময়" পরিচ্ছেদে চুম্বন যুদ্ধের বর্ণনায় একস্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ;—

"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ভগদত্ত এবং অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুন প্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন ; অর্জ্জুনকে অগ্নিবানে অক্ষম জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, তাহার শমতা করেন। সেইরূপ, কমলমণিও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে, সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল। কিন্তু

ইহাদের এইরূপ সন্ধি বিগ্রহ বাদলের বৃষ্টির মত—দণ্ডে দণ্ডে হইত ; দণ্ডে দণ্ডে যাইত।"

বোধ হয় এইখানেই চুম্বন কাব্য অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র কাব্যের সূত্রপাত। যাঁহার প্রতিভা আছে, তিনি সহজেই বুঝিয়া নিলেন যে, অতঃপর চুম্বনালিঙ্গন রূপ "মহাসমরের" উপযুক্ত ও প্রধান ক্ষেত্রই কুরুক্ষেত্র।

অতঃপর পাঠক দেখিলেন যে, আমাদের কর্ম্মদোষে এমন মনোজ্ঞা কমলমণিও ছোটখাট একটি বিষ-বৃক্ষ হইয়া উঠিল। আমরা গ্রন্থের নায়িকা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, গ্রন্থকারও বলিয়াছেন, তাহার কিছু প্রয়োজন ছিল না। বিষ-বৃক্ষ কে, এই কথা নিয়া এত আলোচনা না করিলেও হইত——বিষ-বৃক্ষ সকলই—অথবা গ্রন্থই বিষ-বৃক্ষ। এই অর্থেও বিষ-বৃক্ষ একটী নয়, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি বিষ-বৃক্ষের বাগান। এই বৃক্ষগুলির নীচে সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বীজ পড়িয়া যেরূপ অসংখ্য চারা গজাইতেছে, ইহাতে উভয় ক্ষেত্রে অচিরেই বিষ-বৃক্ষের অরণ্য হইবে। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাহাত্ম্য জীবন্তভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সমকালীন ভক্তেরা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদর্শিত পবিত্র বৃন্দাবন-লীলা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন এবং তাহা দেখাইয়া

সমস্ত বঙ্গদেশ মোহিত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনেও তাঁহারা স্মৃতিশক্তির সাহায্যে বাঁচিয়াছিলেন। আমাদের জন্য তাঁহারা যে মহাজন গাথা রাখিয়া গিয়াছেন, রাগ, তাল, লয় সংযোগে সেইগুলিতে জীবনীশক্তি দিয়া রাধা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব জীবিত রাখার চেষ্টা হইতেছিল। যাত্রা, পাঁচালী, কবি, কীর্ত্তন সকলেরই উদ্দেশ্য তাই। এখনও সাধু বৈষ্ণবেরা জানেন, মাধুর্য্য ভাবের সাধনায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কি উপাদেয় বস্তু। ভক্ত বৈষ্ণবগণের বিতরিত সেই প্রেমামৃত পানে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অদ্য পর্য্যন্তও চরিতার্থ হইতেছে। তাহাদের নিকট রাধাকৃষ্ণের নাম ও তাঁহাদের প্রেম অভিন্ন বস্তু। সেই প্রেম রূপজ মোহই হউক, কি গুণজ প্রণয়ই হউক, হিন্দুর বিশ্বাস তাহাতে লোকের পরিত্রাণ হয়। সেইরূপ বাৎসল্য ভাবের উপাসনার লৌকিক প্রচারের জন্য দুর্গোৎসব, আগমনী, দশমী, রামপ্রসাদী ও রামদুলালী মালসী। হিন্দুর আমোদ প্রমোদেও ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মভাব হিন্দুর জাতীয় জীবন। বাঙ্গালী অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে মানি। সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সেই অর্থে জাতীয় উন্নতির পক্ষে শাক্তধর্ম্মাপেক্ষা চৈতন্যের প্রচলিত ধর্ম্ম অধিকতর অনিষ্টকারী—চৈতন্য ধর্ম্মের বহুল প্রচার সমস্ত বাঙ্গালী জাতিতে একরূপ স্ত্রীস্বভাব আনয়ন

করিয়াছে, ইহা স্বীকার করি। এই অপরাধে গ্রন্থকার প্রভৃতি কর্তৃক বটতলার স্বরস্বতী বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছেন। কিন্তু চিন্তার বিষয় এই যে চৈতন্যের ন্যায়, গ্রন্থকার যে আর একরূপ বিজাতীয় প্রেমে বঙ্গসমাজ মাতাইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালী উন্নত হইবে কি আরও অধঃপতিত হইবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, মনে করি, আমরা হাট কোট পরিয়াইইংরেজ হইব আর স্ত্রীলোকদিগকে ইংরেজি নিয়মে গাউন পরাইয়া চুম্বনালিঙ্গন শিখাইলেই বঙ্গীয় সমাজ সর্ব্বতোভাবে ইংরেজিসমাজ হইবে। বটতলার সরস্বতীর নির্য্যাতন হইয়াছে। কীর্ত্তিবাস, কাশীদাস নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। ভাগবত কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে ঘরে ঘরে বঙ্কিমি কীর্ত্তন হইতেছে। হিন্দু স্ত্রীর স্বামী আর দেবতা নয়—সামান্য ভোগ্য বস্তু। বৃন্দাবনের হরি মিথ্যা। লণ্ডনের হরি সত্য। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলীতে এই শেষোক্ত হরির কীর্ত্তন—"আদবন্তেচ মধ্যেচ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে"। চৈতন্যের ভক্তগণ হইতেও অধিকতর উৎসাহের সহিত বঙ্কিম বাবুর শিষ্যগণ কার্য্য করিতে লাগিলেন। বঙ্কিম বাবু এই ধর্ম্মের গীতা অর্থাৎ দর্শন লিখিতে বসিলেন। সেই গীতা "দেবী চৌধুরাণী," শ্রীকৃষ্ণ এবার প্রফুল্ল অথবা দেবী চৌধুরাণীরূপে অবতীর্ণ হইলেন, বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অর্থাৎ ব্যাস হইলেন। প্রথমে লীলা

প্রচার—প্রবাদ এইরূপ যে প্রফুল্ল বুনোর ঔরষে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম নিলেন, অতএব পরিত্যক্তা হইয়া ঘোষেদের বাড়ী বেগুন ভিক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। ডাকাইতের ঘরে ব্রহ্মচর্য্য করিলেন, পূর্ব্ব জন্মে বাঁশী বাজান্ নাই "পায়েনো" বাজাইয়া থাকিবেন, সেইজন্য বিনা শিক্ষায় বজরার ছাদের উপর অলৌকিক বীণাবাদন করিলেন। নিষ্কাম ধর্ম্মদ্বারা স্বামীকে ধরিয়া আনিয়া দ্বিতীয় ভার্য্যার পদতলে ফেলিলেন এবং স্বামীর তিন কাণাকড়ি মূল্য নির্দ্ধারণ করাইলেন। এ সকল স্বামী-স্ত্রী প্রণয়ের গভীর তত্ত্ব প্রচারিত হইলে পরে প্রফুল্ল লীলা সম্বরণ করিলেন, বলিয়া গেলেন—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

এইরূপে প্রেমের গীতার প্রচার হইল ও ব্যাস প্রচারিত শ্রীকৃষ্ণের গীতার আদ্যশ্রাদ্ধ হইল, এবং নবীন বাবু যথাসময়ে "কুরুক্ষেত্র" কাব্যে তাহার সপিণ্ডীকরণ করিলেন। গ্রন্থকার হিন্দুরমণীর হৃদয়ের গভীরতর হইতে গভীরতম সাগর মন্থন করিয়া যে ভাবরত্নের উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহার একরূপ পূর্ণ বিকাশ বিষবৃক্ষেই হইয়াছিল। তিনি তাহাতেই দেখাইয়াছেন, যে অবস্থায় সীতা, সুনীতি পতির আদেশমত মুনির

আশ্রমে থাকিয়া স্বামীপদচিন্তা ও ব্রহ্মচর্য্য করিতে লাগিলেন, সে অবস্থায় হিন্দু রমণীর সেরূপ করা স্বাভাবিক না—হয় বাহির হইয়া যাইতে হয় নচেৎ বিষ খাইয়া মরিতে হয়। মালবিকা, শকুন্তলা, পার্ব্বতী ও রাধার রূপজ মোহ মাত্র, কালিদাস জয়দেব তাহারই কবি। পার্ব্বতী বৃদ্ধ বর কামনায় কঠোর তপস্যা করিলে, মহাদেব ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়া পার্ব্বতীকে নানারূপ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"যদুচ্যতে পার্ব্বতি পাপবৃত্তয়ে নরূপমিত্য ব্যভিচারি তদ্বচঃ।
তথাহি তে শীলমুদার দর্শনে তপস্বিনামপ্যুপদিশ্যতাং গতম্॥

অতঃপর যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহাও "আর্য্য দিগের সেই রূপজ মোহ"। গ্রন্থকার প্রণয়তত্ত্ব ভালরূপ বুঝাইয়া দিলেন,—উৎকৃষ্ট প্রণয় ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল, তথাপি কমলাকান্ত বলে ভালবাসা কি তাহা সে জানে না। সে আফিং খোরের কথায় কাজ কি? গোয়ালিনীর প্রতি তাহার, কুন্দনন্দিনীর প্রতি সূর্য্যমুখীর স্বামীর, ভ্রমরের স্বামীর প্রতি বিধবা রোহিণীর, প্রতাপের প্রতি ভট্টাচার্য্য চন্দ্রশেখরের ব্রাহ্মণীর যে ভাব তাহা হইতে উচ্চ প্রণয় কোন্ জাতির ইতিহাসে আছে? পাঠক মহাশয় এই শেষোক্ত চরিত্রটী দেখুন দেখি? ঘাটে স্নান করিতে যায়, মুখ আগাইয়া সাহেবের দিকে

চাহিয়া থাকে, কথা কয়, বন্দোবস্ত করে, কেননা সাহেব প্রতাপ অভিন্ন, জানে যে সাহেবের কাছে গেলেই প্রতাপ প্রাপ্তি, তাহা হইলেও জলে ডুবিয়া তাহার সহিত প্রণয়ালাপ করিতে পারে। এত কথার পরও মূর্খ কমলাকান্ত বলে ভালবাসা কি তাহা জানি না? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কমলাকান্তের মত মূর্খ দুই চারি জন এখনও রহিয়াছে। ইহা গ্রন্থকারের দোষ নয়—তাঁহার শিষ্যদিগের দোষ। কিন্তু পাঠক অপেক্ষা করুন্ গৌরাঙ্গের ভক্তেরা এক দিনেই আর সকলকে ভজাইয়াছিলেন না। পরে উপার্জ্জনের পন্থার সহিত ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইলেই তাহার সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবুর শত শত ভক্তেরাও উপার্জ্জনের পন্থায় এই উৎকৃষ্ট অভিনব প্রণয় ও মধুর ভাবের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, সময়ে সকলই সুসিদ্ধ হইবে। সমাজ ও সাহিত্যের বিপ্লব অনিবার্য্য। যাঁহারা বলেন বিপ্লবে যেরূপ মঙ্গল সেইরূপ অমঙ্গলও হইতে পারে, আস্তে আস্তে সকল বিষয়েরই উন্নতি হওয়া আবশ্যক, তাঁহাদের বড়ই ভ্রম। ভালর জন্যই হউক আর মন্দের জন্যই হউক তাহা বিচার করার প্রয়োজন নাই, অপিচ বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব জনসমাজের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়।

সমাপ্ত।